প্রথম আলো

একমত হয়নি দলগুলো, সুপারিশ দেবে কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন

ছয়টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে মতভিন্নতা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের সময় ও পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক মতবিরোধ রেখেই দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অনড় অবস্থানের মুখে ঐকমত্য কমিশন বলেছে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত সমন্বয় করে আগামী দু-এক দিনের মধ্যে কমিশন সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ দেবে।

১৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৭ অক্টোবরের মধ্যে জুলাই সনদে স্বাক্ষর হবে বলে কমিশন আশা করছে।

গতকাল বুধবার বেলা তিনটায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে দলগুলোর সঙ্গে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে পঞ্চম ও শেষ দিনের আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা শেষ হয় রাত সোয়া ১১টায়। আলোচনা বিটিভি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

গতকাল শেষ দিনের আলোচনায় দলগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে দেখা গেছে। বিএনপিসহ কিছু দল জাতীয় নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোটের পক্ষে অনড় থাকে। আর জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ কিছু দল জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে অবস্থান নেয়। গণভোটের প্রশ্ন কী থাকবে, ভিন্নমত থাকা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন কীভাবে হবে—এসব প্রশ্নেও সুরাহা হয়নি।

ছয়টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। এর খসড়া চূড়ান্ত হলেও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য হয়নি। এ কারণে আটকে আছে জুলাই সনদ।

সনদ বাস্তবায়নের উপায় ঠিক করতে ঐকমত্য কমিশন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছে। এর পাশাপাশি কমিশন ১১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। গতকাল পর্যন্ত মোট পাঁচ দিন দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছে কমিশন। এর মধ্যে গত রোববার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সম্মতি নিতে গণভোট করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

কিন্তু গণভোট কবে ও কিসের ভিত্তিতে হবে, ভিন্নমতের কী হবে—এগুলো নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা ছিল। গতকাল বেলা তিনটার দিকে দলগুলোর সঙ্গে মুলতবি আলোচনা শুরু করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। শুরুতে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ দলগুলোকে গণভোটের সময় ও পথ-পদ্ধতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে দীর্ঘ আলোচনায় দলগুলো কমবেশি আগের অবস্থানই তুলে ধরে। ফলে শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য হয়নি।

দলগুলোর অবস্থান

- বিএনপিসহ কিছু দল চায় জাতীয় নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট।
- জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ কিছু দল চায় নির্বাচনের আগে গণভোট।

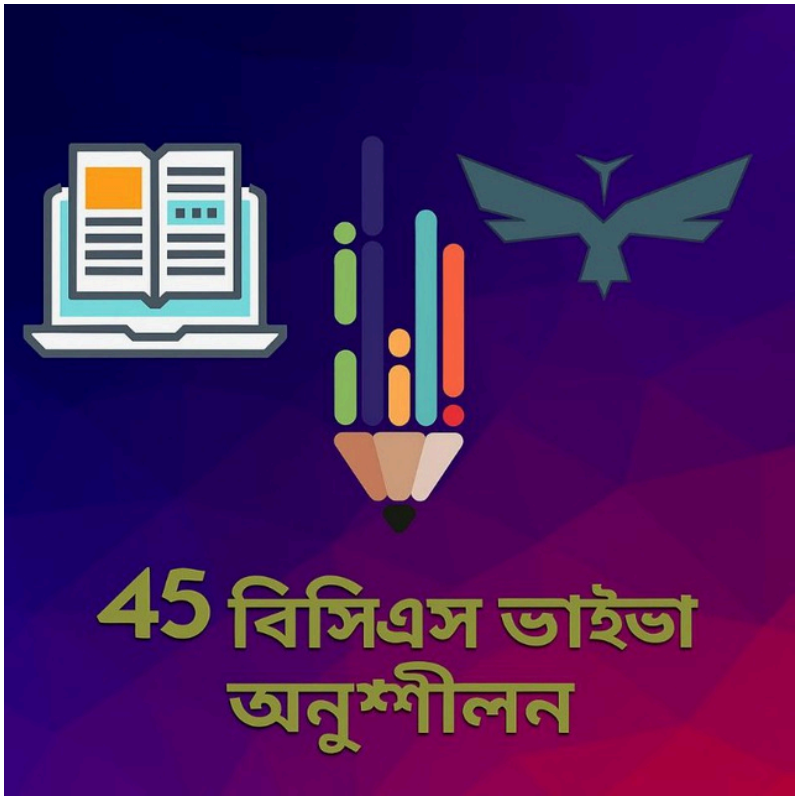
বিশেষজ্ঞদের ৫ সুপারিশ

১ একটি আদেশ জারি করতে হবে।
২ ওই আদেশের মাধ্যমে গণভোট।
৩ গণভোটে দুটি আলাদা প্রশ্ন থাকতে হবে।
৪ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ হবে।
৫ আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধান সংস্কার।

বিএনপির অবস্থান

জাতীয় নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট দেওয়ার পক্ষে মত তুলে ধরে বিএনপি। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ জাসদ, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটসহ বেশ কিছু দল সংসদ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট দেওয়ার পক্ষে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১



একমত হয়নি দলগুলো, সুপারিশ দেবে কমিশন

আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের অল্প সময় বাকি আছে। এর আগে গণভোটের মতো মহাযজ্ঞ আয়োজন করা সম্ভব নয়। এতে অতিরিক্ত অর্থও খরচ হবে। তাঁরা মনে করেন, আগে গণভোট করার প্রস্তাব জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার প্রয়াস হবে।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জুলাই সনদ নিয়ে সংবিধান আদেশ বা এ ধরনের কোনো আদেশ নয় বরং একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা যায়। সেটার নাম আদেশ হতে পারে। তার ভিত্তিতে গণভোটের জন্য একটি নতুন আইন অধ্যাদেশ আকারে করা যায়। তার ভিত্তিতে গণভোট হবে। গণভোট হলে আগামী সংসদকে আলাদা গাঠনিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, গণভোটের মাধ্যমেই জনগণ তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করবে। গণভোটে জুলাই সনদ পাস হলে তা বাস্তবায়ন করা আগামী সংসদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

আগামী সংসদ জুলাই সনদের বাইরে সংস্কার করতে পারবে না তা নয় উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জুলাই সনদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করতেই হবে। প্রয়োজনে আরও সংশোধনী আনতে পারবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, জুলাই সনদে সব দলের ভিন্নমতে কে কী বলেছে, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকতে হবে। আর সনদের অঙ্গীকারে একটি বিষয় যুক্ত করতে হবে, যেসব দলের যে যে বিষয়ে ভিন্নমত আছে, সেগুলো তারা নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করবে। জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হলে সে দল তাদের ভিন্নমত অনুসারে প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জামায়াতে ইসলামী আগামী সংসদের প্রথম অধিবেশনে জুলাই সনদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের কথা বলেছে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন রাখেন, সেটা করতে হলে প্রথম অধিবেশন কত লম্বা হবে, যদি দুই বছর লাগে? তিনি মনে করেন, এ ক্ষেত্রে সংসদকে সময় বেঁধে দেওয়া ঠিক হবে না। সংসদের স্বাধীনতা থাকতে হবে, প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। এখানে যথা শিগগির সম্ভব আগামী সংসদ সনদ বাস্তবায়ন করবে, এভাবে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

জামায়াত ও এনসিপির অবস্থান

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াতে ইসলামী। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ আলোচনায় বলেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বা মধ্যভাগে গণভোট হতে পারে। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই দিন গণভোট হলে কিছু জটিলতা তৈরি হবে। তিনি বলেন, মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবগুলো সনদ থেকে বাদ দিয়ে গণভোট দিলে তা ঠিক হবে না। কোনো দলের মতামত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি আইনজীবী শিশির মনির বলেন, বিশেষ সংবিধান আদেশ বা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের প্রয়োজন আছে। এই আদেশে গণভোটের কথা বলা থাকবে। আদেশের তফসিলে জুলাই সনদ থাকবে। এই আদেশের ভিত্তিতে গণভোট হবে।

আগামী সংসদের দুটি ক্ষমতা থাকবে উল্লেখ করে শিশির মনির বলেন, একটি সাধারণ সংসদের ক্ষমতা, অন্যটি কনস্টিটুয়েন্ট পাওয়ার বা গাঠনিক ক্ষমতা। সংসদের প্রথম অধিবেশনে এই ক্ষমতা থাকবে। দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে সাধারণ সংসদ কাজ করবে। এভাবে হলে সংস্কার টেকসই হবে। তিনি বলেন, যে কটি বিষয়ে ভিন্নমত আছে, সেগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো না হলে সংস্কার মুখ থুবড়ে পড়বে।

এর আগে জাতীয় নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট করা যায়, এমন মত দিলেও নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে এনসিপি। এখন দলটি বলেছে, জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট হতে হবে। আর গণভোট করতে হলে তার আগে একটি আদেশ জারি করতে হবে। এ ছাড়া আগামী সংসদকে দ্বৈত ভূমিকা পালনের ক্ষমতা দিতে হবে।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেন, এমন প্রক্রিয়ায় যাওয়া ঠিক হবে না, যাতে সংস্কারগুলো ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বা বাতিল হয়ে যেতে পারে। সংস্কারকে টেকসই করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

যে নামেই হোক, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ আগে জারি করতে হবে উল্লেখ করে জাবেদ রাসিন বলেন, এই আদেশের ভিত্তিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে কি না, এই প্রশ্নে গণভোট হবে এবং আগামী সংসদকে বিশেষ কনস্টিটুয়েন্ট পাওয়ার (গাঠনিক ক্ষমতা) দিতে হবে। কারণ, সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংস্কার করা হচ্ছে। এটি করতে হলে আগামী সংসদকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট হলে গণভোট গুরুত্ব হারাবে।



আলোচনা শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। গতকাল রাত সোয়া ১১টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে। ছবি : নোমান ছিদ্দিক

বিএনপি-জামায়াতকে বসার অনুরোধ

আলোচনায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে আলাদাভাবে বসার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াত বসেন। কথা বলে আপনারা ঠিক করেন। নিজেরা যদি ঠিক করে ফেলতে পারেন, তাহলে উই ক্যান গো ফর ইলেকশন।'

আলোচনায় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম ও গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার বাইরে দলগুলো নিজেরা বসে ভিন্নমত কমিয়ে আনা যায় কি না, সে চেষ্টা করার পরামর্শ দেন।

এ ছাড়া আরও কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপির পক্ষে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি প্রশ্নে ছাড় দেওয়া সম্ভব কি না, সেটা হলে দলগুলো বিশেষত জামায়াতের সঙ্গে নিম্নকক্ষে পিআরের দাবিতে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

তবে আলোচনায় বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জুলাই সনদ প্রণয়ন প্রক্রিয়া 'ক্লোজড ডাপটার'। এখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে থাকাই ভালো।

বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ

গতকাল আলোচনার সমাপনী ভাষণে সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরেন ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। সেগুলো হলো : ১. একটি আদেশ জারি করতে হবে। ২. ওই আদেশের মাধ্যমে গণভোট আয়োজন করতে হবে। ৩. গণভোটে দুটি আলাদা প্রশ্ন থাকতে হবে, ঐকমত্য বা বৃহত্তর ঐকমত্য আছে যেসব বিষয়ে, সেগুলো নিয়ে একটি, আর ভিন্ন মত বা নোট অব ডিসেন্ট আছে যেসব বিষয়ে, সেগুলো নিয়ে আরেকটি। ৪. নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। ৫. এই আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণভোটে অনুমোদন সাপেক্ষে জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত সংবিধান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্কারসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আলী রীয়াজ বলেন, বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত সমন্বিত করে আগামী দু-এক দিনের মধ্যে আলোচনা করে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদেরও এ বিষয়ে অবহিত করা হবে।

সমাপনী বক্তব্যে আলী রীয়াজ বলেন, 'আমরা সবাই জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে একটি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে আমরা সবার সহযোগিতা থাকবে। যে যেখানে থাকি, যেভাবে থাকি, যে দল করি, যে আদর্শে বিশ্বাস করি, আমাদের এই ঐক্য যেন বজায় থাকে, সেটা যেন অব্যাহত থাকে এবং আমরা যেন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। যার অংশীদার হব আমরা এবং যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তার সুফলটা ভোগ করতে পারে।'

এর আগে কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ইফতেখারুজ্জামান ও মো. আইয়ুব মিয়া এবং জাতীয় ঐকমত্য গঠনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বক্তব্য দেন।

সংস্কারপ্রক্রিয়ার এক বছর

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনার লক্ষ্যে প্রস্তাব তৈরির জন্য গত বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে সরকার। সেগুলো হলো সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কমিশন। গত ফেব্রুয়ারিতে এই কমিশনগুলো তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেয়। সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই কমিশনের সভাপতি। অবশ্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় কমিশনের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

ছয়টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে কমিশন দলগুলোর সঙ্গে দুই পর্বে আলোচনা করে। প্রথম পর্বে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত দলগুলোর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করে কমিশন। দ্বিতীয় পর্বে ২০টি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ২ জুন থেকে ৩০টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে আলোচনা শুরু করে কমিশন। কমিশনের লক্ষ্য ছিল জুলাই মাসের মধ্যে জুলাই সনদ সই করা; কিন্তু তা হয়নি। ৩১ জুলাই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষ হয়। ২০টি মৌলিক প্রস্তাবের মধ্যে অন্তত ৯টিতে কোনো কোনো দল ভিন্নমত দেয়।

দুই পর্বের আলোচনার ভিত্তিতে মোট ৮৪টি প্রস্তাব (ভিন্নমতসহ) নিয়ে জুলাই সনদের খসড়া চূড়ান্ত করে ঐকমত্য কমিশন; কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে দুই পর্বের আলোচনায় মতৈক্য হয়নি। পরে দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে কমিশন। বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে দলগুলোর লিখিত মতামতও নেওয়া হয়।

প্রথম আলো

বিশেষজ্ঞদের ৫ সুপারিশ

১ একটি আদেশ জারি করতে হবে।

২ ওই আদেশের মাধ্যমে গণভোট।

৩ গণভোটে দুটি আলাদা প্রশ্ন থাকতে হবে।

৪ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ হবে।

৫ আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধান সংস্কার।

প্রথম আলো

গণ-অভ্যুত্থানের শক্তির ক্ষমতার এক বছরে শ্রীলঙ্কা কী পেল

শ্রীলংকা

শ্রীলঙ্কার গণ-অভ্যুত্থানে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দল ও জোটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোট দিয়ে জয়ী করে। সরকার পরিচালনায় গত এক বছরে তারা কেমন করল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **আলতাফ পারভেজ**



অনুরা কুমার দিশানায়েকে

- ক্ষমতার প্রথম ১২ মাসে জেভিপি-এনপিপি জোটের জনসমর্থন কমেছে এমন ইঙ্গিত নেই। তবে রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে প্রত্যাশার অনেকটা এখনো পূরণ হয়নি।
- ইতিমধ্যে আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারত, চীন, জাপান সব দেশে সফর করেছেন একেডি। সবার কাছ থেকে সরকার বিনিয়োগ চাইছে, তবে পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে দেশটির সবাই 'একেডি' বলে। পুরো নাম অনুরা কুমারা দিশানায়েকে কেবল কাগজপত্রেই লেখা হয়। সেপ্টেম্বরে তাঁর সরকারের এক বছর হলো। ২০২২ সালের অভ্যুত্থান শেষে সেখানে দুই বছর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল।

গত বছর অভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচনে একেডি প্রেসিডেন্ট হন। কিছুদিন পর পার্লামেন্ট নির্বাচনেও তাঁদের দল জেভিপি (জনতা বিমুক্তি পেরামুনা) বড় অঙ্কের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জেতে। সব মিলে গত এক বছরে দেশটিতে পুরোনো প্রধান দুটি দলের (ন্যাশনাল পার্টি ও পড়ুযানা পেরামুনা) আধিপত্য ভেঙে অনেকখানি জেভিপি-জোটের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন চলছে তাদের গত এক বছরের সরকার পরিচালনার মূল্যায়ন।

ভোটের রাজনীতিতে তারুণ্যের উত্থান যেভাবে

শ্রীলঙ্কায় ২০২৪ সালের আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ২০১৯ সালে। সেবার একেডি ভোট পান ৩ শতাংশ। এই ফল বিস্ময়কর ছিল না। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দুই দলের কেউ প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটিই জানেন সবাই। কিন্তু পুরোনো শাসকদের দুর্নীতি রাজনীতির চেহারা এতটাই বদলায় যে গত বছরের নির্বাচনে অনুরা ভোট পান ৪২ শতাংশ। কয়েক মাস পর সংসদ নির্বাচনে তাঁদের জোট (এনপিপি) ভোট পায় ৬২ শতাংশ; যা আগের নির্বাচনে ছিল ৩ শতাংশ।

পুরোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারগুলোর প্রভাব ছিন্নভিন্ন করে ভোটাররা তরুণ একেডি ও তাঁর সহযোগীদের পছন্দ করেছিলেন দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকারের কারণে। জনগণের আরেকটা চাওয়া ছিল অর্থনীতির পুনর্গঠন। তারা দেশটির কুলীনদের আর বিশ্বাস করছিল না।

কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান যতটা 'কবিতার মতো', সরকার পরিচালনা ততই 'আবেগহীন গদ্যে'র মতো। একেডি নিশ্চয়ই এটা জানতেন। গত বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর শপথের সময় তিনি বলছিলেন, 'আমাকে ভোট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি জাদুকর নই। অনেক কিছু আমি জানি; কিন্তু বহু কিছু জানি না। দেশকে পুনর্গঠন করতে যৌথ উদ্যোগ লাগবে।' জেভিপি এখনো যৌথতার মনোভাব ধরে রেখেছে বটে; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিষয়ে জনতার মতামত মিশ্র।

অর্থনীতির রিপোর্টকার্ড

গণ-অভ্যুত্থান ও নির্বাচনের মাঝখানের দুই বছরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশটির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মূলত আইএমএফের নির্দেশনাগুলো মেনে চলেছে। সরকারি ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি উন্নয়নধর্মী কাজে সরকারি বিনিয়োগ কমেছে। জেভিপি এসবের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের মত ছিল আমলা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি কমিয়ে অর্থনীতি ঠিক করা সম্ভব। ক্ষমতায় বসে অবশ্য একেডি ইতিমধ্যে চলমান আইএমএফের প্রেসক্রিপশনের বাইরে যাননি। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদে আছেন। প্রশাসনকে কড়া নজরদারিতে রেখেছেন সরকারি দলের রাজনীতিবিদেরা।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মিছিলগুলোতে জেভিপির ক্যাডাররা স্লোগানে বলতেন 'কোন পথে আমরা যাব—আমরা চে গুয়েভারার পথে যাব।' জেভিপি সেটি পারেননি। চের কিউবা কখনো আইএমএফের ঋণ বা পরামর্শ কিছু না নিলেও একেডি সেই সাহস করতে পারছেন না। এটা অস্বাভাবিকও নয়। রাজাপক্ষে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে খুব বিপন্ন অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলেন। ম্যাক্রো অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বেদনাদায়ক পথ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না।

আইএমএফের একটি নির্দেশ কেবল জেভিপি অগ্রাহ্য করছে। তা হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাইভেটাইজেশন বন্ধ রাখা। সরকার সিলন পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ও সিলন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে ইচ্ছুক। একইভাবে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইনসকেও রাখতে চায়। এসবের ব্যবস্থাপনা বদলাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটি আইনও করা হয়েছে, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্য হয়তো পাল্টাবে।

জেভিপিকে বামপন্থী বলা হয়। তবে দুই বার সশস্ত্র বিপ্লব করতে গিয়ে মার খেয়ে এবং ২০১২ সালে দলের বিপ্লবী অংশ বেরিয়ে ফ্রন্টলাইন সোশ্যালিস্ট পার্টি (এফএসপি) দল করায় জেভিপি অনেকটাই এখন মধ্যপন্থী রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে আছে। যাদের রাজনীতিতে সিংহলি জাতীয়তাবাদেরও বেশ প্রভাব। তাদের শক্তিভিত্তিও মুখ্যত সিংহলি ভোটাররা। রাজাপক্ষদের প্রভাব থেকে বের করে ওই সিংহলিদের কাছে টানতেই ১১ বছর আগে ৪৫ বছর বয়সী একেডিকে জেভিপির প্রধান করা হয়।

মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবীদের স্থানীয় ধাঁচের সংগঠন করার কাজে এক দশক পরিশ্রম শেষে গত বছর তাঁর প্রতি দলের আস্থাকে নির্বাচনী বিজয়ে পরিণত করতে পারলেন একেডি। এই বিজয়ের মূল সাংগঠনিক জাদু ছিল বিভিন্ন পেশাজীবীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে কাছে এনে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) নামে একটি জোট গড়ে জেভিপি ২০১৯ সালে। সিংহলি ভাষায় যাকে ওরা বলে 'জাতিকা জন বালাওয়াগা'।

এই জোটে রেডিক্যাল বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও শিল্পীদেরও নেওয়া হয়। এসবের মাধ্যমে শহুরে এলাকায় তারা সবল হলেও গ্রামে দুর্বলই থেকে যায়। তবে সেই সংকট কাটে রাজাপক্ষদের আমলে কৃষি খাতে সংকটের সময়। কৃষকদের সারের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করে তারা। এটিই এনপিপিকে গ্রামীণ ভোটারদের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

ক্ষমতার প্রথম ১২ মাসে জেভিপি-এনপিপি জোটের জনসমর্থন কমেছে এমন ইঙ্গিত নেই। তবে রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে প্রত্যাশার অনেকটা এখনো পূরণ হয়নি। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে ইতিবাচক মন্তব্য আছে অনেক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে এবং মূল্যস্ফীতি কমেছে। সময়সূচি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় দেনা পরিশোধের চাপ কমানো গেছে। সংকোচনের জায়গা থেকে অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারায় এসেছে। ২০২২-২৩-এর উল্কো আর নেই লঙ্কাবাসীর মনে। তবে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর গতি খুব ধীর।

সরকার সচেতনভাবে বছরপূর্তি উৎসব এড়িয়ে গেছে। কারণ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় প্রত্যাশিত মাত্রায় কমেনি গত এক বছরেও। খাদ্যপণ্যের দাম এখনো চড়া। সম্ভবত সে কারণেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের চেয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এনপিপি জোট ভোট কম পেয়েছে (৪৩ শতাংশ)। যদিও আগের দুই নির্বাচনের মতো তারা প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে। শেষোক্ত নির্বাচনের ফল ইঙ্গিত দিচ্ছে মানুষ একেডি সরকার নিয়ে সন্তুষ্ট হলেও উচ্ছ্বসিত নয়। কর্মসংস্থানের ঘাটতি এবং আয়কর ও ভ্যাটের বোঝা নিয়ে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের অসন্তুষ্টি আছে।

রাষ্ট্রীয় উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের বেলাতেও এখনো বড় আকারে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকার দুই জায়গায় জোর দিচ্ছে—কারিগরি শিক্ষা ও ডিজিটাল ইকোনমির প্রসার। দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিসরও বাড়িয়েছে সরকার। গরিবদের নগদ অর্থসহায়তাকে সরকার পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করেছে।

তবে নিচুতলার সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে যে সম্পদ দরকার, তার জন্য ভবিষ্যতে সম্পদ কর এবং উত্তরাধিকার কর বসাতে বলছে আইএমএফ। এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপে টিম-একেডি যাবে কি না, সেটি দেখার ব্যাপার। এ রকম পদক্ষেপ না নেওয়া গেলে সম্পদ আহরণের বিকল্প আর পথ নেই সরকারের হাতে। তবে কর আহরণের নতুন এসব পদক্ষেপকে উপলক্ষ করে সিংহলি ডানপন্থীরা সামাজিক অসন্তোষও ধূমায়িত করে তুলতে পারে।

প্রধান বিরোধী নেতা মধ্যপন্থী সজিথ প্রেমাদাসা মৃদু ভাষায় সরকারের সমালোচনা শুরু করলেও এনপিপি জোটের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে কেবল উগ্র শক্তিগুলো। সেই ভয় থেকেই হয়তো জেভিপি রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী ধাঁচের প্রশাসনিক নীতিতে হাঁটছে।

গত আগস্টে সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিলকে দুর্নীতির এক মামলায় গ্রেপ্তার করা হলে বিরোধী দলগুলো সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে এক দফা। পরে রনিল জামিন পাওয়ায় সেই উদ্যোগ এগোয়নি। রনিলকে ছাড় দেওয়া থেকে মনে হয়েছে সরকার নিজেও রাজনৈতিক কোনো সংঘাত চাইছে না; বরং সংস্কারকর্মী কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে ইচ্ছুক।

গত এক বছরের আকর্ষণীয় একটি উদ্যোগ ছিল ১০০টি রেলস্টেশনের আধুনিকায়ন ও কলম্বোর মূল বাস টার্মিনালের উন্নয়ন উদ্যোগ। এ রকম প্রকল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে জনপরিসরকে প্রকৃতিবান্ধব ও যাত্রীবান্ধব করার দিকে। সরকার বলছে, তারা মানুষের জীবনের গুণগত দিকের উন্নয়ন করতে চায়।

খরচ কমাতে ইতিমধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্টদের দায়িত্বকাল পরবর্তী সুবিধার তালিকা ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়েছে, এমপিদের পেনশনের নিয়ম বাদ দিতে বিল আনা হয়েছে এবং তাঁদের বিমা সুবিধার পরিমাণ চার ভাগের এক ভাগ করা হয়েছে।

দুর্নীতি রোধ ও রাজনৈতিক সংস্কার

গত এক বছরে অনুরাদের এনপিপি সবচেয়ে ভালো পেরেছে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরার কাজ। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে অল্প অগ্রগতি ঘটেছে, তা হলো প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা কমানোর বিষয়ে প্রত্যাশিত সংস্কার।

লঙ্কায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো একচ্ছত্র। দেশটিতে সরকারের কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার পেছনে এটাই বড় কারণ। সাংবিধানিক পদগুলোর নিয়োগে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমানো এবং পার্লামেন্ট ও প্রদেশগুলোর ক্ষমতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে পুরোনো দাবি রয়েছে সেখানে। জেভিপি ও এনপিপি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। প্রথম বছরেই সরকার এ বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে মতামতের জন্য উপস্থাপন করেছে। তবে সংসদে এ বিষয়ে এখনো বিল আনা হয়নি। এ ধরনের সংস্কারের জন্য সংসদে এনপিপির প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এ বিষয়ে গণভোটও লাগবে। অনুরাকে এই সংস্কারে হাত দিতেই হবে ভবিষ্যতে।

দুর্নীতির বিষয়ে বিগত সরকারের আমলের বহুল আলোচিত কিছু কেলেংকারী নিয়েও তদন্তে হাত দিয়েছে সরকার। এমপি ও আমলাদের অর্থ-সম্পদের বিবরণী প্রকাশে সরকার বেশ কঠোর হয়েছে। কিছুদিন আগে জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে একেডি চমৎকার একটা কথা বলেছেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজে নামায় বিপদ আছে, তবে না নামায় বিপদ বেশি।' একেডি সরকার তার প্রথম বছরে নেপালে দুর্নীতিবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান দেখেছে। একেডির কথাটা নেপালের রাজনৈতিক ঘটনাবলির পটভূমিতে বেশ বোধগম্য।

অপেক্ষায় তামিলরা

দুর্নীতির ব্যাপারে কঠোরতার পাশাপাশি সংখ্যালঘু তামিলদের বিষয়েও একেডি কিছু সফলতা দেখিয়েছেন। অতীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জেভিপি ভোটই পেত না। এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অনেক তামিল তাঁদের ভোট দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বেশ কয়েকবার ওই সব এলাকায় গেছেন। জেভিপি যদি প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষমতা কমানোর কর্মসূচিতে সফল হন, তাহলে পরোক্ষভাবে তামিলদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়বে। ২২৫ আসনের সংসদে তামিল এলাকা থেকে প্রায় ১৫ জন এমপি হন। তামিল এমপিরা তখন জাতীয় রাজনীতি ও প্রশাসনে কিছুটা হলেও প্রভাব বিস্তারে সুযোগ পাবেন, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে যেটি প্রায় অসম্ভব।

পার্লামেন্টারি পদ্ধতির প্রাধান্যের মাধ্যমে দেশটির রাজনীতিতে বহুত্ববাদী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনতে পারেন একেডি। তবে প্রিভেনশন অব টেরোরিজম অ্যাক্ট নামের দানবীয় আইন তামিলদের মধ্যে এখনো বড় অসন্তোষের কারণ হয়ে আছে। তবে তাদের জন্য স্বস্তির জায়গা হলো সরকারি দল সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক পুঁজি সংগ্রহ করছে না।

অনেকের মতে, অনুরার মন্ত্রিসভা সবচেয়ে দক্ষতা দেখিয়েছে বৈদেশিক সম্পর্কের বেলায়। চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র কেউই লঙ্কায় এখন আর নিজেদের কোণঠাসা বোধ করছে না। সরকারের ওপর বিদেশি কোনো দেশের বাড়তি প্রভাব আছে বলেও মনে হচ্ছে না। কোনো বিদেশি মুরব্বির দিকে হেলে পড়েনি সরকার।

ইতিমধ্যে আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারত, চীন, জাপান—সব দেশে সফর করেছেন একেডি। সবার কাছ থেকে সরকার বিনিয়োগ চাইছে, তবে পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে। আমন্ত্রণ পেয়েও গত নভেম্বরে ব্রিকস সম্মেলনে যাননি অনুরা। আবার তাঁর সরকার শ্রীলঙ্কার মান্নারের সঙ্গে ভারতের তামিলনাড়ুর স্থল ব্রিজ প্রকল্পও বাতিল করেছে। এই দুই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এনপিপি বোঝাতে চাইছে, আপাতত চীন-ভারত উভয় থেকে স্বশাসিত দূরত্বে থাকতে চায় তারা।

তবে দেশ-বিদেশে সবাই সরকারের কাজে গতিশীলতার অভাব দেখছে। একধরনের শিক্ষানবিশ ভঙ্গি ও টানাপোড়েন ছিল সরকারে গত ১২ মাসে। এর বড় কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণ নতুন একটি টিম এটি। সরকারের অনেকেই প্রথমবার প্রশাসন পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়েছে, ফলে অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল। তবে সেই দুর্বলতা ঢাকতে বড় বড় হাঁকডাক দেওয়া হয়নি বা জনগণকে বোকা বানানোর মতো লোকরঞ্জনবাদী কাজেও লিপ্ত হননি লঙ্কার মন্ত্রীরা, যেমনটি ঘটছে আমাদের দেশে।

● **আলতাফ পারভেজ,** ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

*মতামত লেখকের নিজস্ব

প্রথম আলো

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোন দিকে

আসিম সাজ্জাদ আখতার

প্রায় আট দশক আগে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে জন্ম নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা আজও এক কঠিন ও জরুরি কাজ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দুই দেশের জনগণ এখনো ঘৃণা, সন্দেহ ও সামরিক উন্মাদনায় বন্দী—যেন একে অপরের রক্ত দেখেই তারা আশ্বস্ত হতে চায়।

এ বছরের ১৪-১৫ আগস্টে যখন দুই দেশ স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করেছে, তখনো মে মাসের সীমান্ত সংঘর্ষের তীব্রতা কাটেনি। দুই পাশ থেকেই 'আমরাই জিতব' ধরনের বিদ্রূপাত্মক স্লোগান উঠেছে। যদিও অনেকেই ঘৃণার এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, তবু ভারত ও পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের বড় অংশই জানে না যে তাদের ইতিহাস এক ছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎও আসলে একসঙ্গে গড়া যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের নতুন ঢেউয়ের মুখে আমি এখানে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাব্য কিছু ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরতে চাই। শুধু ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়েই এখানে প্রায় ১৭০ কোটি মানুষ বাস করে। যদি বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালকেও ধরা হয়, তাহলে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০ কোটিতে।

সবচেয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হচ্ছে—আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, সেটাই আরও গভীরভাবে ও কঠিনভাবে টিকে থাকবে। হিন্দুত্ববাদ, উগ্র ইসলামবাদ আর বিদেশিবিদ্বেষী জাতীয়তাবাদের নানা রূপ তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি প্রভাবিত করবে।

ভারতের ক্ষেত্রে এর মানে হবে—বিজেপি, আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) প্রভাব সমাজে আরও শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর মানে হবে—সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা আরও পোক্ত হবে, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো সেনাবাহিনীর ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, আর ধর্মীয় ডানপন্থী শক্তিগুলো রাস্তায় নেমে বড় আন্দোলন গড়ে তোলার সামর্থ্য অর্জন করবে। কিন্তু আমাদের এই বিপজ্জনক বাস্তবতাকে কখনোই স্থায়ী ধরে নেওয়া উচিত নয়।

দুই দেশেই রাষ্ট্রবিরোধী সহিংসতা আরও বাড়বে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চল বহুদিন ধরে নিপীড়নের শিকার, সেখানে এগুলো বাড়বে। 'সন্ত্রাস দমন'-এর নামে রাষ্ট্র আরও ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে। এর ফলে ঘৃণা, ভয় ও বিভাজনের রাজনীতি সমাজের একমাত্র চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে। সেখানে শান্তি, সহাবস্থান কিংবা মানবিক সংলাপের কোনো জায়গা থাকবে না।

তবু এই 'অধঃপতনের দৌড়'-এর গতি কিছু সময়ের জন্য থামাতে পারে যদি উদার বা মাঝারি ধারার রাজনীতি কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়।

ভারতে এর অর্থ হতে পারে কংগ্রেস ও তার সহযোগী কয়েকটি ছোট দল ক্ষমতায় ফিরে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের কিছু দিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। পাকিস্তানে এর মানে হতে পারে বর্তমান 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থার' (অর্থাৎ সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের মিশ্র রূপ) বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দিতে পারে।



স্বাধীনতার আট দশক পরেও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। ফাইল ছবি : রয়টার্স

তবে এই উদার কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা গুরুতর। তারা প্রচলিত উন্নয়ন মডেল—যা জমি কেড়ে নেওয়া, পরিবেশ ধ্বংস ও অন্ধ ভোগবাদে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—তার কোনো বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিতে চায় না। ফলে এই মধ্যপন্থী প্রতিরোধও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিকবাদী ও অতি-ডানপন্থী শক্তিগুলো আরও গভীরভাবে রাষ্ট্রের ভেতরে শিকড় গাড়বে।

সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কিন্তু একমাত্র টেকসই ভবিষ্যৎ হতে পারে—জনগণনির্ভর ঐক্যের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও যৌথ সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা। এটা তখনই সম্ভব, যখন শ্রমজীবী মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী প্রগতিশীল শক্তিগুলো একসঙ্গে আসবে। কাজটি সহজ নয়, কারণ দক্ষিণ এশিয়ার বাম ও প্রগতিশীল রাজনীতি এখন প্রায় নিস্তেজ অবস্থায় আছে। তবু আমাদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। স্থবির বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নতুন রাজনীতির স্বপ্ন দেখতে হবে।

এই নতুন রাজনীতির জন্য বামপন্থী ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলোর (যারা শ্রেণিসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি করে) দরকার জাতিগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলা। না হলে এমন কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি তৈরি হবে না, যা অতি ডানপন্থা ও উদার কেন্দ্র—দুয়েরই আধিপত্য ভাঙতে পারে।

ভারতে হিন্দিভাষী উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্য ভাঙতে হবে। কাশ্মীরি, নাগা, আদিবাসী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর ঐতিহাসিক নিপীড়ন স্বীকার করতে হবে এবং দক্ষিণ ভারতের প্রগতিশীল নেতাদের জন্য আরও জায়গা তৈরি করতে হবে।

পাকিস্তানে বালুচ, পশতুন, গিলগিট-বালটিস্তানি, কাশ্মীরি, সিন্ধি ও সিরাইকি জনগণের জাতীয় প্রশ্নগুলোকে শ্রেণিনির্ভর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

সবশেষে দরকার একটি আঞ্চলিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ—লাদাখ থেকে বালটিস্তান, দুই কাশ্মীর থেকে সিন্ধু ও রাজস্থান, দুই পাঞ্জাব থেকে ডুরান্ড রেখার দুই পাশের পশতুন, এমনকি সবচেয়ে নিপীড়িত বালুচ ও নাগাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন হিসেবে দেখা হবে।

শুধু এই মানবিক ঐক্যই পারে সাম্রাজ্যবাদের সব রূপকে ইতিহাসের আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলতে।

● **আসিম সাজ্জাদ আখতার** কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের



প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি বাধা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই। এসব রোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর ১৭টি রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাত এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ খাত আজ দেশের একটি অন্যতম প্রধান উন্নয়নমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৫ লাখ প্রান্তিক খামারি তাদের দৈনিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে দুই-তিনটি করে পশু পালন করে থাকেন। পবিত্র ঈদুল আজহা তথা কোরবানিকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারি গবাদি পশু লালনপালন করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। শুধু পোলট্রি খাতেই প্রায় ৬০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৪০ শতাংশই নারী।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপিতে অবদান ১.৮১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৯ শতাংশ। কৃষিজ জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৬.৫৪ শতাংশ। দেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটি গরু, ১৫ লাখ মহিষ, ৩ কোটি ছাগলভেড়া এবং ৪০ কোটি হাঁস-মুরগি রয়েছে। এসব গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫৫ লাখ মেট্রিক টন দুধ, ৮৯.৫৪ লাখ মেট্রিক টন মাংস এবং ২৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রান্তিক খামারিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসেবে পোলট্রি শিল্প ইতিমধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। এই খাতে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামার থেকে বছরে ৩৫ লাখ এক দিনের বাচ্চা সরবরাহ করে। দেশে পোলট্রি ও ডেইরি খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিকাশ লাভ করেছে। দেশে বছরে প্রায় ৭৫ লাখ মেট্রিক টন পোলট্রি ও ডেইরি ফিড উৎপাদন হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিড মিলের সংখ্যা ৩৪২টি। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ অনুসরণপূর্বক এই সমস্ত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপর একটি খাত হলো দেশের ডেইরি খাত। বর্তমানে দেশে প্রায় ২.৫ কোটি গবাদি পশুর মধ্যে ৮৬ লাখ দুগ্ধবতী গাভি রয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ লাখ দেশীয় গাভি এবং ৪১ লাখ সংকর জাতের গাভি। দুগ্ধ খাতে শতকরা ৮০ ভাগ খামারি প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক ও নারী, যারা মোট উৎপাদিত দুধের শতকরা ৭০ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪২৭৮টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ১৭ লাখ উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নে (যেমন—রেড চিটাগাং ক্যাটেল, মীরকাদিম, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল গ্রে ও নেত্রকোনা ব্ল্যাক) পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওরের মহিষের প্রাপ্যতা ও উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। সরকারি তিনটি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার (বাগেরহাট মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, টাঙ্গাইল মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার এবং মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার সাভার, ঢাকা) থেকে ভর্তুকি মূল্যে এসব হাওর ও বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের মধ্যে মহিষের বাচ্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নিত্যনতুন চর ও সরকারি খাসজমি খামারিদের মধ্যে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সমবায়ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে, যাতে এসব অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠী মহিষ পালনে আরো উৎসাহী হয়।

প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি বাধা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই। এসব রোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ১৭টি রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভূত গবাদি পশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ১৭ লাখ মাত্রা টিকা মাঠপর্যায়ে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, গবাদি পশুর অন্যতম খুরা রোগ (FMD) মুক্ত অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যে দেশের চারটি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ভোলা) টিকাদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। সারা দেশ থেকে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগ পিপিআর (PPR) নির্মূলে প্রায় ৬ কোটি ডোজ টিকা সাম্প্রতিক সময়ে মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাণী থেকে মানবদেহে ছড়ায় এ রকম সংক্রামক জুনোটিক রোগ; যেমন—অ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতঙ্ক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ পরীক্ষণে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ১৯৬৪ সালে মিরপুর ঢাকায় প্রায় ১৮৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় ১৩৫টি প্রজাতির ৩ হাজার ৩২৫টি প্রাণী রয়েছে। বছরে প্রায় ৪০-৪৫ লাখ দর্শনার্থী এই চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। চিড়িয়াখানা থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

পবিত্র রমজান মাসে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্পমূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং খামারিদের সহযোগিতায় মোট ৪৯৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে এ বছর ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার জন ভোক্তার মাঝে মোট ৩১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার সমমূল্যের প্রাণিজ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, বিপুল বিস্তৃত প্রাণিসম্পদ খাতে যে সব উদ্যোক্তা কাজ করছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করা, এই সেক্টরে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং এই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা, প্রাণিসম্পদ খাতে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা উপস্থাপন করা। আকর্ষণীয় স্থানীয় উন্নত জাতের গবাদি পশু ও পোলট্রির প্রদর্শন করা এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি প্রাণিজ খাবারের সঙ্গে সবাইকে পরিচিত করানোর জন্য 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



● লেখক : সচিব, মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গাজায় শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার পরিবর্তন

ওসামা আল-শরিফ



এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসে। এর একটি কারণ ছিল বটে। কেননা নেতানিয়াহু সেই ভূমিকাকে বানচাল করে দেন। এখন ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে আবার চালকের আসনে বসিয়েছেন এই আশায় যে, গাজায় যুদ্ধবিরতি একটি বৃহত্তর চুক্তির দরজা খুলে দিতে পারে। লক্ষণীয়, ট্রাম্প এখন তার আরব ও মুসলিম মিত্রদের কথা শুনছেন। তার এই উদ্যোগ একটি নবায়নকৃত শান্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে



গত সোমবার থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হয়েছে শারম এল-শেখ-এ। এখানে হামাস ও ইসরাইল পরোক্ষ আলোচনায় অংশ নিচ্ছে। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে গৃহীত ও বহুল আলোচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০-দফা পরিকল্পনা কীভাবে কার্যকর করা হবে, তা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোই এই আলোচনার লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরীয় মধ্যস্থতাকারীদের অংশগ্রহণে চলছে এই আলোচনা। ট্রাম্পের চাপে ইসরাইল গাজা সিটিতে তাদের বিমান হামলা হ্রাস করতে সম্মত হয়। তবু অবরুদ্ধ ছিটমহলটি থেকে আসা খবরে জানা যায়, ইসরাইলি বোমা হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং গাজার সর্বত্র ফিলিস্তিনি হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গাজা সিটির বেশির ভাগ অংশ এখন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে শহরের কিছু অংশে রয়ে যাওয়া কয়েক হাজার বাসিন্দা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা গাজার সর্বত্র মানবিক পরিস্থিতির অবনতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে হামাসের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকীর প্রাক্কালে মিশরে এই আলোচনা শুরু হয়েছে। এই সময়ে, অধিকাংশ ইসরাইলি ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই পরিকল্পনায় হামাসকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত ও মৃত সব ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। শুক্রবার হামাস জানিয়েছে, তারা কয়েকটি শর্ত ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে। তাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ছিল গাজা থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার এবং ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন শাসনকাঠামোর মতো বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্টতা প্রদান করা। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে তাদের অবস্থান এখনো অস্পষ্ট।

তবে উভয় পক্ষই মার্কিন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু সংরক্ষণের কথা জানালেও, বাস্তবতা হলো এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গাজার যুদ্ধ শেষ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এই যুদ্ধে কমপক্ষে ৬৭ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখেরও বেশি আহত হয়েছে। গাজার অবকাঠামোর ৮০ শতাংশেরও বেশি ধ্বংস হয়ে গেছে। ট্রাম্প চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন। ফলে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর শারম এল-শেখ-এ তার প্রতিনিধিদল পাঠানো ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

পরিকল্পনায় বিশদ বিবরণের অভাব থাকলেও, এতে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি এবং গাজায় ইসরাইলের স্থায়ী দখলদারিত্বের বিষয়গুলো আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। এটি এখন বাস্তবতা এবং ট্রাম্প ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। এমনটাও মনে হচ্ছে, তিনি মূল নথিতে কিছু সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। এই সংশোধনীগুলোর ব্যাপারে ট্রাম্প দুই সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্কে আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এছাড়া, উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, ট্রাম্প কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাটির প্রতি হামাসের 'হ্যাঁ, তবে...' ধরনের প্রতিক্রিয়াকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়েছিল। এই বিষয়টি পরিকল্পনাটির অন্যতম সহপ্রণেতা ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে পরোক্ষ আলোচনার তত্ত্বাবধানের জন্য মিশরে পাঠাতে উৎসাহিত করে। ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নেতানিয়াহু হামাসের শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যানস্বরূপ দেখেছিলেন। তবু, ট্রাম্প চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন, ফলে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর শারম এল-শেখ-এ তার প্রতিনিধিদল পাঠানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে গাজা সিটি দখল করার নেতানিয়াহুর পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন। ইসরাইলি নেতার মতে, হামাসের শেষ ঘাঁটি হলো গাজা। কিন্তু এরপর, হঠাৎ করেই তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করেন। তিনি আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আহ্বান জানান। তিনি এমন একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, যার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ শেষ করা এবং ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতের একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পথ তৈরি করা। আলোচনা চলার সময়েই হামাস ও মধ্যস্থতাকারীদের উচিত ইসরাইলের ওপর অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

এই হৃদয় পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বেশ কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গত মাসে দোহায় ইসরাইলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হামলা। এই সময় হামাস নেতারা একটি আমেরিকান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হয়েছিলেন। এই হামলাই ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানকে সমর্থন জানাতে সৌদি আরব ও ফ্রান্স উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমা দেশ কর্তৃক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সেটিও ছিল আরেকটি কারণ।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, মূল কারণটি ভিন্ন। ট্রাম্পের ভেতরের মহল (inner circle) স্বীকার করতে শুরু করেছিলেন যে, নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ইসরাইল উভয়ের জন্যই একটি ব্যক্তিগত বোঝায় পরিণত হচ্ছেন। ট্রাম্প স্বীকার করেন, গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধ তেলআবিবকে অভূতপূর্ব বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ফলে তার ঘনিষ্ঠতম মিত্রদের সঙ্গে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র জনমতের স্রোত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয় দলের তরুণদের মধ্যে। এমনকি আমেরিকান ইহুদিরাও এখন দ্বিধাবিভক্ত। সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে, ১০ জন মার্কিন ইহুদির মধ্যে চার জনই একমত যে, ইসরাইল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে।

ট্রাম্পের আরব ও মুসলিম মিত্ররা গাজায় এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অসমর্থনীয় হয়ে পড়ে। ট্রাম্পের পরিকল্পনাটি আদর্শ নয়। এর বিশদ বিবরণ নেতানিয়াহুকে সময় কেনার সুযোগ দেবে, যখন তিনি এটি বানচাল করার উপায় খুঁজবেন। তার চরম ডানপন্থি জোটের অংশীদাররা প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন যে, তিনি যদি গাজা থেকে প্রত্যাহার ও যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হন, তবে তারা জোট ছেড়ে চলে যাবেন। আপাতত, তিনি দেখতে চাইছেন, হামাস সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার ধারাটি কার্যকর করে কি না, যার ফলে হামাসের হাতে থাকা অবশিষ্ট যে কোনো আলোচনার সুবিধা (leverage) দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু নেতানিয়াহু ট্রাম্পের শুভেচ্ছা হারাচ্ছেন, যিনি এখন ব্যক্তিগতভাবে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত। অন্যান্য জটিল বিষয় পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নকে আরো কঠিন করে তুলবে। এর মধ্যে প্রধান হলো নিরস্ত্রীকরণ ইস্যুটি, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করে শাসনকাঠামো, তাতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (PA) ভবিষ্যৎ ভূমিকা (যদি কোনো ভূমিকা থাকে), গাজা থেকে ইসরাইলের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, পুনর্গঠন এবং পশ্চিম তীরের ভবিষ্যতের সঙ্গে এর সংযোগ।

আরেকটি জটিল বিষয় হলো, গাজায় একটি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা বাহিনীর (International Peacekeeping Force) উপস্থিতি, যা একটি অস্থায়ী আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (International Stabilization Force) হবে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূমিতে এই ধরনের বাহিনী মোতায়েন হবে এই প্রথম। এই বাস্তবতা নেতানিয়াহু এবং তার অংশীদারদের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করবে। কারণ একদিন পশ্চিম তীরের জন্যও এটির প্রস্তাব করা হতে পারে।

আলোচনা চলার সময়েই হামাস এবং মধ্যস্থতাকারীদের উচিত ইসরাইলের ওপর অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ সৃষ্টি করা। হামাস সঠিকভাবেই দাবি করেছে যে, ইসরাইলের গোলাগুলোর মধ্যে তারা মৃতসহ সব জিম্মিকে উদ্ধার করতে পারবেন না। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গাজায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা আবশ্যক। এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী, যখন উভয় পক্ষ চুক্তিতে সম্মত হবে, তখন গাজায় অবিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ সরবরাহ শুরু হওয়া উচিত। সেটি এখনো ঘটেনি।

ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে, তবে তা হলো মধ্যপ্রাচ্যের ধারাবাহিক পরিকল্পনাগুলো কদাচিৎ তাদের লক্ষ্য অর্জন করে। তারা যেমন বলে, শয়তান লুকিয়ে থাকে বিশদ বিবরণে (The devil is in the details)। আর নেতানিয়াহু কোনো চুক্তিতে সূক্ষ্ম শর্ত (fine print) যুক্ত করতে এক মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হামাস গাজার প্রশাসনে কোনো ভূমিকা না রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হলো, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে (PA) কোনো এক সময়ে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা তারাই।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসে। এর একটি কারণ ছিল বটে। কেননা নেতানিয়াহু সেই ভূমিকাকে বানচাল করে দেন। এখন ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে আবার চালকের আসনে বসিয়েছেন এই আশায় যে, গাজায় যুদ্ধবিরতি একটি বৃহত্তর চুক্তির দরজা খুলে দিতে পারে। লক্ষণীয়, ট্রাম্প এখন তার আরব ও মুসলিম মিত্রদের কথা শুনছেন। তার এই উদ্যোগ একটি নবায়নকৃত শান্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

● লেখক : আম্মানে বসবাসকারী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আরব নিউজ থেকে অনুবাদ : ফাইজুল ইসলাম

বঙ্গোপসাগরে ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ

জিয়াউল হক মিজান

বাংলাদেশের অগভীর ও গভীর সমুদ্রের তলদেশে ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের খনিজ সম্পদ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। অগভীর সমুদ্রে মিলেছে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল 'ক্লে'র সন্ধান। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের ১৩টি স্থানে পাওয়া গেছে ইলমেনাইট, গার্নেট সিলিমানাইট, জিরকন, রুটাইল ও ম্যাগনেটাইট সমৃদ্ধ ভারি খনিজ বালু। বাংলাদেশের সমুদ্র ভাগেও রয়েছে বড় ধরনের গ্যাসের মজুত। বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগর থেকে বছরে আড়াই লাখ কোটি ডলারের সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় দেশ বর্তমানে আহরণ করছে মাত্র ৯৬০ কোটি ডলারের সম্পদ।

বিশেষজ্ঞরা জানান, বঙ্গোপসাগরে সম্ভাবনাময় অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে তেল, গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি। রয়েছে আরও ১৭ ধরনের খনিজ বালু। এর মধ্যে ইলমেনাইট, জিরকন, রুটাইল, ম্যাগনেটাইট, গ্যানেট মোনাজাইট, কায়ানাইট, লিকোক্সিন উল্লেখযোগ্য। এগুলোর দামও অনেক বেশি। তাদের মতে, বঙ্গোপসাগরে অর্জিত সমুদ্রসীমা থেকে প্রায় ১০ লাখ টন এসব খনিজ বালু আহরণ সম্ভব। এ ছাড়াও সাগরের তলদেশে ক্লেসার ডেপোজিট, ফসফরাস ডেপোজিট, এডাপোরাইট, পলিমেটালিক সালফাইড, মাঙ্গানিজ নডিউল নামক খনিজ পদার্থ আকরিক অবস্থায় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এদের পরিশোধনের মাধ্যমে লেড, জিংক, কপার, কোবাল্ট, মলিব ডেনামের মতো দুর্লভ ধাতুগুলো আহরণ করা সম্ভব হবে। এ সব দুর্লভ ধাতু উড়োজাহাজ নির্মাণে, রাসায়নিক কারখানায় এবং বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যাবে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা।

মহামূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের জলসীমা, বছরে অন্তত আড়াই লাখ কোটি ডলার আহরণ সম্ভব

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে বর্তমানে বছরে তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের সাড়ে সাতশ' কোটি মানুষের ১৫

(১২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

বঙ্গোপসাগরে ট্রিলিয়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভাগ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার জোগান দিতে বিশ্ববাসীকে তাকিয়ে থাকতে হবে সমুদ্রের দিকেই। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে সমুদ্রনির্ভর ব্লু-ইকোনোমির বদৌলতে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো সাগর-উপসাগরে নেই। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অবদান মাত্র ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬ শতাংশ।

জানা যায়, দেশের সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ব্লু ইকোনোমি খাতের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে ৯টি খাতে সুনির্দিষ্ট করে কাজ চালাচ্ছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় দুবছর গবেষণার পর গতবছর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত সমুদ্র এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির কিছু মূল্যবান উদ্ভিজ এবং প্রাণিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেট ছাড়াও ২২০ প্রজাতির সি-উইড বা শ্যাওলা, ৩৪৭ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪৯৮ প্রজাতির ঝিনুক, ৫২ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ৬ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৬১ প্রজাতির সি-গ্রাস রয়েছে।

জানা যায়, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র বিজয়ের পর ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়ন করে সরকার। এ কর্মপরিকল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির সঙ্গে সমন্বয় করে ২০১৮ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুত নিরূপণ ও মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন ও ২০০ মিটার গভীরতার ঊর্ধ্বে বাণিজ্যিকভাবে টুনা ও বৃহৎ মৎস্য আহরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এরই মধ্যে ১১টি লং-লাইনার এবং ৮টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মোট ১৯টি ট্রলার কোম্পানিকে ফিশিং লাইসেন্সের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান ওশেন টুনা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করেছে বাংলাদেশ। এর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদারকরণ, অবৈধ ফিশিং নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও সুন্দরবন অঞ্চলের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ডাটাবেজ তৈরি ও মেরিকালচার ও কোস্টাল একুয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। ৩২ দিনব্যাপী এ অভিযানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩ জন বিজ্ঞানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ২৬ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন। জরিপে ছোট পেলাজিক ও মেসোপেলাজিক মাছের প্রাচুর্য ও মজুত নিরূপণ, তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য মূল্যায়ন এবং সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সমুদ্রের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, স্রোতের গতি, উৎপাদনশীলতা, গভীর সমুদ্র সঞ্চালন ব্যবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, টেকসই আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পদ ও পরিবেশের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, বঙ্গোপসাগরের একটা অংশও আমাদের দেশ। এর পরিমাণ মোট জমির পরিমাণের চাইতে বেশি। বঙ্গোপসাগর আমাদের দেশের মূল্যবান অংশ, এ কথা সবসময় মাথায় রেখে অগ্রসর হব। এই অংশের পানির ওপর দিয়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করব। এর মাধ্যমে আমরা পুরো পৃথিবীকে আমাদের প্রতিবেশী বানাব। উপকূল অঞ্চল অফুরন্ত সম্ভাবনার আধার মন্তব্য করে তিনি বলেন, কুমিরা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত নানা বন্দরের কর্মচাঞ্চল্যে সমগ্র উপকূল অঞ্চলকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

বঙ্গোপসাগরে ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান ভারি খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে জানিয়ে বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রভাষক নাদিয়া ইসলাম নদী গণমাধ্যমকে বলেন, এসব মূল্যবান সম্পদ সঠিক উপায়ে উত্তোলন করতে পারলে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি হলে বাংলাদেশের বন্দরের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের ফিডার পরিষেবা কার্যক্রম বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের বন্দরসমূহ কলম্বো, সিঙ্গাপুর বন্দরের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা বা ঢেউকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। কিন্তু ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো এই উৎসের ব্যবহার করতে পারেনি।

ব্লু-ইকোনমিকে সমৃদ্ধ করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জানিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওশনোগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুসলেহ উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, এ জন্য পরিকল্পনার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিও যুক্ত করতে হবে। কারণ, এই অর্থনীতির অংশ হিসেবে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। আধুনিক জাল ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় আমাদের জেলেরা বঙ্গোপসাগর থেকে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে মাছ ধরতে পারছে না জানিয়ে তিনি বলেন, ব্লু-ইকোনমির একটা বড় দিক হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। তারপর আরেকটি দিক ট্রান্সপোর্টেশন। বাংলাদেশে সামুদ্রিক ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে বড় একটা অর্থনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারে। গত ১০ বছরে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক মেরিন আর্কিটেক্ট, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গড়ে উঠেছে এবং তারা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের মেরিন ইঞ্জিনিয়াররাই কাজ করছে। বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডের ব্যবসাটাকে আন্তর্জাতিক মানের করতে পারলে আমরা ব্লু-ইকোনমির আরেকটি দিক অর্জন করতে পারব বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সুনীল অর্থনীতির সুফল পেতে হলে দূষণ নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর জন্য কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সর্বস্তরের জনসচেতনতা একসঙ্গে কার্যকর করতে হবে। যদি আমরা সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে বঙ্গোপসাগর শুধু আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও এক সমৃদ্ধ সম্পদভাণ্ডার হয়ে থাকবে।

তিনটি আসনই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। সম্ভাব্য মনোনয়নপ্রত্যাশীরা নানা কায়দায় ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টায় ইতোমধ্যে শহর-গ্রামগঞ্জসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মনোনয়ন প্রত্যাশীদের শুভেচ্ছা জানানো পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পাচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের অলিতে-গলিতে।

প্রায় দেড় যুগ ধরে ঠাকুরগাঁও জেলার তিনটি আসনে রাজত্ব করেছে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি। তবে এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জেলার তিনটি আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া বিএনপি। বসে নেই জামায়াতে ইসলামী। দেশের সর্ব উত্তর-পশ্চিমের জেলা ঠাকুরগাঁও মূলত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে জাতীয়তাবাদী সমর্থক ভোটারও বেশি।

নির্বাচনী এলাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী ভোট অনেক বেশি। এতদিন তাদের জুজুর ভয় দেখিয়ে ও ভুল বুঝিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করেছে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ। তবে জুলাই বিপ্লবের পর তাদের মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন

এআইয়ের ব্যবহারে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭% চাকরি ঝুঁকিতে

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দাপট। এতে দক্ষতাপূর্ণ চাকরি যেমন হুমকিতে পড়ছে, তেমনি চাকরির নতুন নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট : জবস, এআই অ্যান্ড ট্রেড' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমবাজারে ৭ শতাংশ চাকরি সরাসরি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। অন্যদিকে এ অঞ্চলের প্রায় ১৫ শতাংশ চাকরি এআই প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। এতে আরো বলা হয়েছে, এআই দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমবাজারে একই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনা ও বড় ঝুঁকি বয়ে আনবে, যা নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় সামগ্রিকভাবে এআইয়ের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। কারণ এখানকার বেশির ভাগ মানুষ কম দক্ষ, হাতে-কলমে ও কৃষিনির্ভর পেশায় নিযুক্ত। তবে এই প্রভাব সবার ক্ষেত্রে সমান হবে না। মাঝারি শিক্ষিত ও তরুণ কর্মীরা, বিশেষত রুটিনধর্মী অফিস বা হালকা জ্ঞানভিত্তিক কাজে যুক্তরা, এআইচালিত স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির কারণে চাকরি হারানোর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন।

তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে এআই মানবশ্রমের বিকল্প নয়, বরং সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীরা এই প্রযুক্তির সাহায্যে উল্লেখযোগ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। এসব পেশায় কর্মরতরা প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি মজুরি সুবিধা পেতে পারেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া, যদি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংস্কারের সঙ্গে এআই গ্রহণ কার্যকরভাবে সমন্বিত করা যায়, তবে এটি বেসরকারি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে, যা দক্ষিণ এশিয়াকে আরো জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির পথে এগিয়ে নেবে। যদিও সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ঝুঁকির দিকও উপেক্ষা করা যায় না। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, জেনারেটিভ এআই এরই মধ্যে কিছু অফিসভিত্তিক চাকরির বিজ্ঞাপন প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে, যা শ্রমবাজারে পরিবর্তনের প্রাথমিক ইঙ্গিত বহন করে।

এই পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সরকারকে ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা এবং শ্রমের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা ও পুনঃপ্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বাড়িয়ে শ্রমিকদের প্রযুক্তিনির্ভর নতুন দক্ষতায় পারদর্শী করে তুলতে হবে।



- এ অঞ্চলের প্রায় ১৫ শতাংশ চাকরি এআই প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে
- দক্ষিণ এশিয়ায় সামগ্রিকভাবে এআইয়ের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম

ইসরায়েলকে কী শর্ত দিল হামাস

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মিসরে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে গত মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো পরোক্ষ আলোচনা হয়েছে। হামাসের কর্মকর্তারা বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং সেনা প্রত্যাহার করে নেবে—এমন নিশ্চয়তা চান তাঁরা। মিসরের পর্যটন শহর শারম-আল-শেখে গতকাল মঙ্গলবার ওই আলোচনা হয়। এদিন ছিল গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় বছর পূর্তি। হোয়াইট হাউসে এ বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, গাজা নিয়ে চুক্তি হওয়ার 'বাস্তব সম্ভাবনা' আছে। মিসরে গতকাল বুধবারও আলোচনার কথা রয়েছে। ওই আলোচনায় যোগ দিতে কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও মিসরে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার হামাসসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বিত জোটের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে সব উপায়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। জোরালোভাবে বলা হয়েছে, 'ফিলিস্তিনি জনগণের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারো নেই।' কথাটি মূলত ট্রাম্পের পরিকল্পনায় হামাসের অস্ত্র সমর্পণের যে দাবির কথা বলা হয়েছে, সেটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ফাওজি বারহুম বলেছেন, তাঁদের আলোচকরা যুদ্ধের অবসান চাইছেন। তাঁরা চাইছেন, গাজা থেকে দখলদার সেনারা পুরোপুরি সরে যাক।

মিসরে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা

- গাজা নিয়ে চুক্তি হওয়ার 'বাস্তব সম্ভাবনা' আছে : ট্রাম্প
- ধাপে ধাপে সেনাদের কবে প্রত্যাহার করা হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি দেওয়া হয়নি

কিন্তু ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইসরায়েলি সেনাদের প্রত্যাহারের বিষয়টি অস্পষ্ট। ধাপে ধাপে সেনাদের কবে প্রত্যাহার করা হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি দেওয়া হয়নি। সেনাদের ধাপে ধাপে তখনই প্রত্যাহার করা হবে, যখন হামাস তাদের কাছে জিম্মি থাকা ৪৮ ইসরায়েলিকে মুক্তি দেবে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই জিম্মিদের মধ্যে ২০ জন এখনো বেঁচে আছেন।

হামাসের ওই কর্মকর্তা বলেছেন, গতকালের আলোচনায় ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির দিন-তারিখ নির্ধারণ এবং ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শেষ ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েলি সেনাদের চূড়ান্ত প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য হামাসের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হয়েছে। মিসরভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-কাহেরা নিউজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হামাসের শীর্ষ আলোচক খলিল আল-হায়া বলেছেন, সংগঠনটি দখলদার বাহিনীকে এক সেকেন্ডের জন্যও বিশ্বাস করে না।

আল-হায়া আরো বলেন, যুদ্ধ শেষ হবে এবং তা যে নতুন করে আর শুরু হবে না, তার নিশ্চয়তা চায় হামাস।

মিসরে আলোচনা চলার মধ্যেও গাজা উপত্যকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি সরকারি সংবাদ সংস্থা ওয়াফার তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার গাজায় ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ১০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার ট্রাম্প ইসরায়েলকে গাজায় বোমা হামলা বন্ধের আহ্বান জানানোর পরও ইসরায়েল থামেনি। শুধু সেদিন থেকে গতকাল পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ১০৪ জন নিহত হয়েছেন। সূত্র : আলজাজিরা

বেকারত্ব নিরসনে করণীয়



ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলম

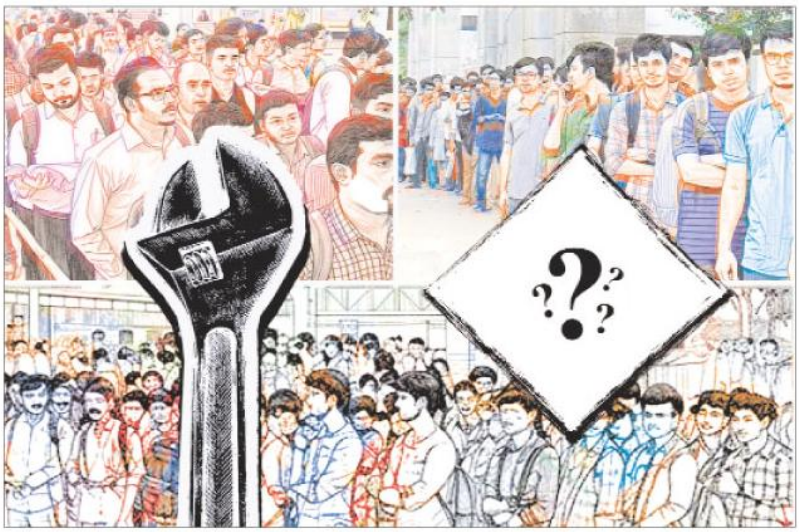
বেকারত্ব সামাজিক অশান্তির একটি প্রধান কারণ। কারণ এটি আর্থিক চাপ, হতাশা ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, যা অপরাধমূলক কার্যক্রম, সামাজিক অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয় বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত তরুণের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে। যা জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বেকারত্বের কারণে ব্যক্তি ও পরিবারের ওপর তীব্র আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়। কাজ না করতে পারার কারণে হতাশা, মানসিক চাপ এবং হতাশা বাড়ে, যা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কর্মহীন বিপুলসংখ্যক মানুষ যখন নিজেদের চাহিদা মেটাতে বা হতাশা থেকে মুক্তি পেতে কোনো পথ খুঁজে পায় না, তখন তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। এতে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বেকারত্বের কারণে নৈতিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। মানুষ ভুল পথে চালিত হতে পারে, যা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। বেকারত্ব সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, যা সামাজিক সংহতিকে নষ্ট করে। এটি সমাজে অসন্তোষ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। কর্মক্ষম কিন্তু কর্মহীন বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা অর্থনীতি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব বেশি, যা একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের অভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত। এই অবস্থা দেশের যুবসমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সামাজিক সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।

১৮ কোটি মানুষের বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬৩ লাখই বেকার। আর এই বেকারদের ৮৭ শতাংশই শিক্ষিত বেকার। ২১ শতাংশ বেকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েও কোনো কাজে যুক্ত নন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৩-এ এই তথ্য উঠে এসেছে। জরিপের তথ্য বলছে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণেরাই বেশি বেকার, যার সংখ্যা ৩৮ লাখ। তাঁরা কোনো কাজকর্ম না করেই বছরের পর বছর চাকরির পেছনে ছুটছেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুসারে, দেশে বর্তমানে ৬২ লাখ ৫৭ হাজার মানুষ বেকার রয়েছে। এই বেকারত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হচ্ছে, কাজ করতে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছেন। এ রকম মানুষের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৫ হাজার, যা মোট বেকারের ৪১ দশমিক ৯৫ শতাংশ। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হলো, সব যোগ্যতা রয়েছে, তারপরও সপ্তাহে ৭-৪০ ঘণ্টা কাজ করছেন। অর্থাৎ যোগ্যতা ও চাহিদা অনুসারে কাজ করতে পারছেন না। এমন মানুষের সংখ্যা ২৪ লাখ ৬১ হাজার, যা মোট বেকারের ৩৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এই ক্যাটাগরির উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, একজন স্নাতক পাস শিক্ষার্থী টিউশনি করছেন। সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা কাজ করছেন। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা রয়েছে ৪৮ কিংবা ৫৬ ঘণ্টা কাজ করার। দেশে প্রকৃত বেকার সংখ্যা কত এর কোনো হিসাব নেই। সরকার বেকারের যে হিসাব দেয়, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, এক দশক ধরেই দেশে বেকারের সংখ্যা ২৫-২৭ লাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

প্রতি বছর কমপক্ষে ২০-২২ লাখ মানুষ চাকরির বাজারে প্রবেশ করেন। তাঁদের এক-তৃতীয়াংশের বিদেশ কর্মসংস্থান হয়। বাকি ১৪-১৫ লাখের কর্মসংস্থান হয় দেশে। বেকারের সংখ্যা যেহেতু প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, এর মানে, প্রতি বছর যত তরুণ-তরুণী কর্মবাজারে প্রবেশ করেন, ঠিক তত সংখ্যক কর্মসংস্থান হয় বাজারে। সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে অর্থনীতিবিদদের। তাঁদের মতে, সরকার যে হিসাব দেয়, প্রকৃত বেকারের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে বিবিএসের হিসাবে, বাংলাদেশে এখন বেকার লোকের সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ। বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ। বিবিএস এখন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপ করে থাকে। ফলে মৌসুমি বেকারদের চিত্র উঠে আসে। বিবিএসের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক হিসাবে, সংজ্ঞা অনুসারে গত সেপ্টেম্বর মাস শেষে ২৬ লাখ ৬০ হাজার বেকার আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল প্রেক্ষাপট ছিল সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল। কারণ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। এ হার প্রায় ৪০ শতাংশ।

এদিকে দুর্নীতির কালো থাবায় বিপন্ন বাংলাদেশ। সর্বনাশা এই মরণছোবলে সমাজ জর্জরিত। প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা– সর্বত্রই দুর্নীতি। শিক্ষিত তরুণ সমাজকে বলা হয় দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু দুর্নীতির করাল গ্রাসে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই হয়ে উঠছে অনিশ্চিত। ফলে হু হু করে বাড়ছে বেকারত্বের হার।

কোনো কর্মক্ষম মানুষ যখন পেশা হিসেবে কাজ খুঁজে পান না, তখন যে পরিস্থিতি হয় তাকে বলা হয় বেকারত্ব। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অভিশাপ হচ্ছে বেকারত্ব। দিন দিন বেড়েই চলেছে বেকারত্বের হার। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশের বেকার যুবসমাজের অর্ধেকের বেশি শিক্ষিত বেকার। আর শিক্ষিত বেকারত্বের অন্যতম কারণ হলো, সব জায়গায় চরম দুর্নীতি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দাসহ বিভিন্ন কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকারত্বের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বেকারত্বের হার বেশি। এদিকে পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। বিবিএসের হিসাব অনুসারে, গত ২০২৪ সালের মার্চ মাস শেষে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ৪০ হাজার। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ১০ হাজার। অন্যদিকে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০ হাজার নারী বেকার কমেছে। এখন নারী বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ ৫০ হাজার। মা-বাবা ছেলে বা মেয়েটির পথ চেয়ে বসে থাকে, কখন তারা পড়াশোনা শেষ করে পরিবারে সচ্ছলতা আনবে, তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হয়েও তাঁদের সন্তানরা পাচ্ছেন না কোনো কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স শেষ করে বসে বসে চিন্তা করতে হয়, এখন কী হবে! কোথাও তাঁদের নেই কোনো কাজের সুযোগ। কোনো শিক্ষার্থী যখন অনার্স মাস্টার্স শেষ করেও চাকরি পান না, তখন তাঁর মধ্যে বিষণ্নতা বহু গুণ বেড়ে যায়। কাজের সুযোগ না পেয়ে অনেকেই মাদকসহ নানাবিধ অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন। হতাশায় জীবন কাটাচ্ছেন। অনেকেই বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ।



বেকারের নীরব যন্ত্রণা কেউ অনুভব করতে পারে না, কেউ বুঝতে চায় না তাঁদের অনুভূতি। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সেশনজট, জরাজীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ও সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে দিন দিন বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। ইউনেস্কোর এক গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা হলো দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান শর্ত। কিন্তু আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা, তা শিক্ষিত জাতির কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে কি? একজন স্নাতক বা স্নাতকোত্তরধারী শিক্ষিত তরুণ পড়ালেখা শেষে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে কাজ না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ফলে দেশ মেধাশূন্য হচ্ছে।

২১-২২ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪৯ হাজার শিক্ষার্থী ৫৭টি দেশে গমন করেন। ২০২২ সালে ১১ হাজার শিক্ষার্থী শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু কেন? ইউনেসকোর তথ্য বলছে, ৭০-৯০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমান। প্রতি বছরই উচ্চশিক্ষা নিতে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন মেধাবীরা। ফলে নীরবে 'মেধা পাচার' হয়ে যাচ্ছে। কেন এমনটা হচ্ছে? কারণ দেশে চাকরির অনিশ্চয়তা, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির আধিপত্য, বিদ্যাপীঠে অনুকূল পরিবেশ না থাকা, লেখাপড়ার বৈশ্বিক মানের ঘাটতি। বাংলাদেশে লেখাপড়া করেও বেকার থাকতে হয়। এখানে চাকরির নিশ্চয়তা নেই। দেশের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষ হলেও মিলছে না কাজ। অথচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় দেখা যায়, বিদেশে উঁচু বেতন দিয়ে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা যোগ্য লোকবল তৈরি করতে অপারগ। শিক্ষিত তরুণদের মেধা ও শ্রমশক্তি যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে দেশের অর্থনীতি আরও এগিয়ে যাবে। এতে বেকারত্বের বোঝা লাঘব হবে। বেকারত্ব জাতি, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ। তাই দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে গবেষণালব্ধ পদক্ষেপ প্রয়োজন। বেকারত্বের ভয়াবহতা দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও সৃষ্টি করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বনির্ভর উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন, সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও উচ্চশিক্ষায় বাস্তবমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কার্যকর জনশক্তি তৈরি করে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। দেশে বিশেষ ধরনের মৌসুমি কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, দেশের কুটিরশিল্প পুনরুদ্ধার করতে হবে।

জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বেকার তরুণ ও তরুণীদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য চাই মাঠপর্যায় থেকেই উদ্যোগ। এছাড়া দেশের তরুণ সমাজকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা। তাহলে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মূল কথা হচ্ছে, বেকারত্ব যেভাবে বাড়ছে তা কমিয়ে আনতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে গোটা জাতিকে বড় ধরনের খেসারত দিতে হতে পারে।

লেখক : সাবেক কর কমিশনার ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান-ন্যাশনাল এফএফ ফাউন্ডেশন

শেয়ার বিজ
The Daily Share Biz

আমানতকারীদের আতঙ্ক না কাটলে একীভূত নতুন ব্যাংক কতটা সফল হবে!

রেজাউল করিম খোকন

দেশে ইসলামি ব্যাংক খাতের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অবশ্য জবাবদিহি না ফিরলে ব্যাংক একীভূত করেও ব্যাংক খাত ঠিক হবে না। ব্যাংক যদি রাজনৈতিক লুটপাটের লক্ষ্য হয় এবং আর্থিক খাতের মূল সংস্কারগুলো না হয়, তাহলে কাজ হবে না। এ জন্য আগে সুশাসন, জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গত ৯ থেকে ১০ মাসেও আর্থিক খাতে পুরোপুরি সুশাসন ফেরেনি



একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের মধ্যে ২ লাখ টাকার কম যাদের আমানত, তারা আগে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের পর সরকারি তহবিল জোগান দেয়া হলেই এসব আমানতকারীর টাকা ফেরত দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২ লাখ টাকা বা তার কম আমানত যাদের, তারা একবারে পুরো টাকা তোলার সুযোগ পাবেন। বাকি আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেয়া হবে ধাপে ধাপে। শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করে একটি ব্যাংক করার যে উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়েছে, তাতে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে পাঁচ ব্যাংককে একীভূত করার কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। উল্লিখিত পাঁচটি ব্যাংককে একীভূত করে গঠন করা হবে 'ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংক' নামে নতুন একটি ব্যাংক। চলতি মাসেই সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে নতুন এই ব্যাংক গঠনের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের কথা রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের পর রাজধানীর মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনে এই ব্যাংকের প্রকল্প কার্যালয় খোলা হবে। ধীরে ধীরে পাঁচ ব্যাংকের সব দায়, সম্পদ ও জনবল নতুন ব্যাংকের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করা হবে। তবে অভিযোগ উঠেছে, অধ্যাদেশে যেভাবে একীভূতকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কথা বলা আছে, তা পুরোপুরি অনুসরণ করা হচ্ছে না। নতুন ব্যাংক গঠনের পর ক্ষুদ্র আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আমানত ফেরত দেয়া শুরু হলে গ্রাহকদের মধ্যকার আতঙ্ক কমে আসবে। ফলে টাকা ফেরত দেয়ার বাড়তি চাপে পড়তে হবে না নতুন ব্যাংকটিকে। নতুন ব্যাংকটি যাতে শুরু থেকে শক্ত ভেতের ওপর দাঁড়াতে পারে, সে জন্য শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিয়োগের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ব্যাংকে এরই মধ্যে বড় ধরনের মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ জন্য নতুন ব্যাংকের মূলধন হচ্ছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দেবে ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া ১৫ হাজার কোটি টাকা আসবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার টাকায় গড়ে ওঠা বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানত বিমা তহবিল ও প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকে শেয়ারে রূপান্তর করার মাধ্যমে। পাঁচ ব্যাংকের সম্মিলিত আমানত গত মে মাসে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকায় নেমেছে। মে মাসে এসব ব্যাংকের ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৪১৩ কোটি টাকা। পাঁচ ব্যাংকের সম্মিলিত খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৭৭ শতাংশ। সবার আগে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের দিকে নজর দিতে হবে। তাদের আতঙ্ক না কাটলে নতুন ব্যাংককে সফল করা কঠিন হবে। দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক গঠনের লক্ষ্যে পাঁচটি সংকটগ্রস্ত ইসলামি ব্যাংককে একীভূত করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে আর্থিক খাত স্থিতিশীল করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। একীভূতকরণের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি ব্যাংক হলো : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পুনর্গঠন উদ্যোগ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ব্যয়বহুল লিকুইডেশন বা অবসায়ন প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলা এবং শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। একই সঙ্গে এটি বেসরকারিভাবে পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকগুলোর গভীর সংকটকেও তুলে ধরেছে, যেগুলোর অনেকগুলোই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কনগ্লোমারেট বা ব্যবসায়িক গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যাদের বিরুদ্ধে তহবিল পাচারের অভিযোগ রয়েছে। সরকারের কমিশন করা ফরেনসিক অডিটে গুরুতর অব্যবস্থাপনার চিত্র দেখা গেছে— তিনটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, বছরের পর বছর দুর্বল তদারকির পর একীভূতকরণই এখন একমাত্র কার্যকর উপায়।

প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও তদারকির জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং দেড় মাসের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ শেষ হবে। এই পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হবে। অবসায়ন অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জন্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল ও কষ্টকর হবে। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। কারণ দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, যার মধ্যে রয়েছে স্থির বিনিময় হার এবং পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। সরকার আপাতত কোনো দাতা সংস্থার সহায়তা চাইছে না, তবে ভবিষ্যতে তা বিবেচনা করা হতে পারে। নতুন ব্যাংকের লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করা হবে বলেও আশা করা হচ্ছে। ব্যাংক একীভূত হলেও গ্রাহকদের লেনদেনে কোনো সমস্যা হবে না। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যাংকটির গ্রাহক হবেন। এ ছাড়া শীর্ষ পর্যায় ব্যতীত অন্য ব্যাংকাররা একীভূতকরণের প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকবেন। এ প্রক্রিয়া শেষ হতে অন্তত তিন বছর লাগতে পারে বলে জানা গেছে। ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর আওতায় এই কার্যক্রম শুরু হবে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। একীভূতকরণের আওতায় ব্যাংকগুলোর যেসব ঋণ খারাপ হয়ে পড়েছে, তা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির (এএমসি) কাছে হস্তান্তর করা হবে। এমনভাবে সম্পদ হস্তান্তর করা হবে, যাতে নতুন ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের নিচে থাকে। এতে বিদেশি বাণিজ্যে লেনদেনে খরচ কম হবে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ব্যাংক টাকা নিতে পারবে। এরপর নতুন একটি ব্যাংকের লাইসেন্স অনুমোদন দেয়া হবে। পাঁচ ব্যাংকের সম্পদ ও দায় সেই ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এরপর ধীরে ধীরে ব্যাংকের শাখাগুলো একীভূত করা হবে। এ জন্য জনবলও কমানো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ওই পাঁচ ব্যাংকের শাখা রয়েছে ৭৭৯টি। এর মধ্যে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের শাখা ২২৬টি, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ১৮০টি, ইউনিয়ন ব্যাংকের ১১৪টি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ১০৪টি ও এক্সিম ব্যাংকের ১৫৫টি। এছাড়া এসব ব্যাংকের ৬৯৮ উপশাখা, ৫০০ এজেন্ট ও ১ হাজার এটিএম বুথ রয়েছে। ব্যাংকগুলোতে জনবল রয়েছে ১৫ হাজারের বেশি। এসব ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৯২ লাখ। আমানত ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা, তবে ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ধার করে আমানতের চেয়ে বেশি ঋণ দিয়েছে ব্যাংকগুলো। দেশে বড় আকারের একটা ইসলামি ধারার ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে দেশে ইসলামি ব্যাংক খাতের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অবশ্য জবাবদিহি না ফিরলে ব্যাংক একীভূত করেও ব্যাংক খাত ঠিক হবে না। ব্যাংক যদি রাজনৈতিক লুটপাটের লক্ষ্য হয় এবং আর্থিক খাতের মূল সংস্কারগুলো না হয়, তাহলে কাজ হবে না। এ জন্য আগে সুশাসন, জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গত ৯ থেকে ১০ মাসেও আর্থিক খাতে পুরোপুরি সুশাসন ফেরেনি। কেন এই সময়ে ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারল না, এটাও বড় প্রশ্ন। ব্যাংক একীভূত করে ভালোভাবে পরিচালনা করা গেলে সেটা ভালো কিছু হবে। এ জন্য কারা পরিচালনা করবে ও সুশাসন কতটা মেনে চলবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনের সঙ্গে এই একীভূতকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আশা করা যায়, আগামী সরকারও এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবে। তবে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংককর্মীদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেছেও, এই একীভূতকরণের ফলে কোনো কর্মীকে চাকরি হারাতে হবে না। কর্মীদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজনে কিছু শাখা পুনর্বিন্যাস করা হবে। যেসব ব্যাংকের শাখা শহর এলাকায় বেশি, সেগুলোর কিছু শাখা গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, ব্যাংকিং খাতের দুর্বল ব্যাংকগুলোকে রক্ষার নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা আর্থিক খাতের সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মানা হচ্ছে না বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্ট অনেকে। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বলে মনে করছেন তারা। এই প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাংকিং খাতের সমস্যা সমাধান করা যাবে না। বরং আরও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে একীভূত করলেই হবে না। সামগ্রিকভাবে ব্যাংকগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। রিয়েল অডিট হয়েছে কি না, যাচাই-বাছাই ছাড়া চাপিয়ে দিয়ে একীভূত করলেই ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এমন ভাবার কারণ নেই। বরং যে ব্যাংকগুলো খারাপ হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার অভাবের মতো বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করে একীভূত করলে ভালো ব্যাংকগুলো ঝুমকির মুখে পড়ার শঙ্কা থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক যে নীতিমালা করেছে তাতে বলা হয়েছে, খারাপ ব্যাংকের পরিচালকরা ব্যাংক একীভূত হওয়ার পাঁচ বছর পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারবে না। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছাঁটাই করার আশঙ্কাসহ নানা অনিশ্চয়তা থাকায় এই প্রক্রিয়া কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টরা। ব্যাংক একীভূত করা নিয়ে এমনিতেই উদ্বিগ্ন ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে এ-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা কিছু কিছু বিধান এ উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, দুর্বল যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হবে, সেটির পরিচালকেরা পাঁচ বছর পর আবার একীভূত হওয়া ব্যাংকের পর্ষদে ফিরতে পারবেন। যদিও এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু শর্ত মানতে হবে। কিন্তু ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ বিধানের মাধ্যমে সেসব পরিচালককে একধরনের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। যাদের কারণে ব্যাংক খারাপ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে পাঁচ বছর বিরতির পর তাদের আবার পর্ষদে ফেরার বন্দোবস্ত রাখা হলো।নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, একীভূত হওয়া ব্যাংকের কর্মীদের তিন বছর পর্যন্ত ছাঁটাই করা যাবে না। এমনকি একীভূত হওয়ার আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে বেতন ও শর্তে কর্মরত ছিলেন, সেই একই বেতন ও শর্তে তাদের বহাল রাখতে হবে। ব্যাংকাররা বলছেন, এ বিধানের ফলে ব্যাংকের কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হতে পারে। এ বৈষম্যের কারণ ব্যাখ্যা করে তারা বলেন, সাধারণত ব্যাংকে প্রতিবছর কর্মীর কার্যমূল্যায়ন করা হয়। তার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। নীতিমালায় খারাপ ব্যাংকের কর্মীদের তিন বছরের জন্য চাকরি ও আর্থিক সুবিধার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। অথচ ভালো ব্যাংকের কর্মীরা প্রতিবছর তাদের কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবেন। ব্যাংক একীভূত করার নীতিমালার কিছু বিধান নিয়ে খাতসংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ থাকলেও সবাই বলছেন, ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একটি নীতিমালার দরকার ছিল; সেটি অন্তত হয়েছে। এখন দরকার সব পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে এটিকে আরও কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করা। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া। বিশ্বব্যাংক বলেছে, ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দরকার। সম্পদের মান ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক একীভূত করা উচিত বলে মনে করে সংস্থাটি। এমনকি ব্যাংক খাতে সংস্কারে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছে বলেও জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এখন পর্যন্ত যেসব ব্যাংককে একীভূত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেগুলো কোন নীতিতে পড়বে, সেটি নিয়ে একধরনের ধোঁয়াশা তৈরি করে এ নীতিমালা। আবার এক বছর সময় দিয়ে বাধ্যতামূলক একীভূত করার যে নীতিমালা করা হয়েছে, সেটিতে পুরো প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘসূত্রতায় পড়বে। এছাড়া নীতিমালার আরও কিছু বিষয়ে উদ্বেগের কথাও জানিয়েছেন বিশ্লেষকেরা।

বাংলাদেশে ব্যাংকের পতন বিরল ঘটনা। কিন্তু পশ্চিমা আর্থিক জগতে এটা অনেকটা নিয়মিত ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। ২০০০ সাল থেকে সেখানে ৫৬৮টি ব্যাংকের পতন ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে ২৫টি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম গোটাতে বাধ্য হয়েছে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ব্যাংকের পতন হয়েছে ২০১০ সালে, ১৫৭টি। ২০০৯ সালে ছিল ১৪০টি। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া আর্থিক সংকট ছিল এর কারণ, যা পুরো পৃথিবীর আর্থিক খাতকে বড় ঝাঁকুনি দিয়েছিল। বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এরপর আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ কঠোর করতে শুরু করে। কিন্তু রাশ আলাগা হলে যে আবার বিপদ আসতে পারে, তা দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরের প্রথমদিকে একে একে চারটি ব্যাংক ধসে পড়ে। বছরের শেষের দিকে আরেকটি।

বাংলাদেশে ব্যর্থতার দায় কেউ স্বীকার করে না। আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রকেরাও ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই ব্যর্থতা পুরো আর্থিক খাতকেই এখন বিপদে ফেলেছে। বেশ কিছু ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়েছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব ব্যাংকে পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়ক হিসেবে নিজস্ব কর্মকর্তা বসিয়েছিল। কিন্তু এরপরও বিশেষ তদারকিতে থাকা বেশির ভাগ ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। দুর্বল ব্যাংকের পরিস্থিতি ভালো হয়নি কেন? এসব ব্যাংকের মালিক ও বড় গ্রাহকদের বেশির ভাগ ছিল সরকারঘনিষ্ঠ । ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক কতটা ভূমিকা রাখতে পেরেছে, এটাও বড় প্রশ্ন। কিন্তু ব্যাংক খাতে যে সংকট, ব্যাংক একীভূত করে কি সেই সংকট কাটানো যাবে এটি একটি বড় প্রশ্ন। এই সংকটের জন্য যারা দায়ী তা মালিক পক্ষ হোক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কিংবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, তাদের ব্যাপারে কী করা হচ্ছে, সেটি আরেকটি বড় প্রশ্ন। ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকেই এখন দাবি উঠেছে, তারা 'লুণ্ঠিত ঋণের' দায় নিতে চান না। এ দেশে আমানতকারীদের অর্থ যারা লুণ্ঠন করেছেন বা লুণ্ঠনে সহায়তা করছেন, তাদের কোনো শাস্তির মুখে পড়তে হয় না। ব্যাংক একীভূত হয়ে আরও বড় যে ব্যাংক হবে, সেখানে লুটপাট বন্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, সেটা জানাও এখন জরুরি।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, কলাম লেখক

প্রথম আলো



প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এলডিসি থেকে উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করতে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা। গতকাল তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে। ছবি : পিআইডি

আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেন।

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হতে হবে যে আমরা আর পরনির্ভর হতে চাই না। আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। এখন যেহেতু পরনির্ভর হয়ে আছি, এর থেকে যত দ্রুত সম্ভব বের হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এর বাইরে আর কোনো কথা নেই।'

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করতে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অধ্যাপক ইউনূস এ কথা বলেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা। পরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে অধ্যাপক ইউনূস বৈঠকে বলেন, 'এ জন্য আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে হবে। আত্মনির্ভর হতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, লড়াই করতে হবে। এটা কঠিন হলেও এ কাজে আনন্দ আছে। আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলি, নতুন বাংলাদেশ মানেই হলো স্বনির্ভর বাংলাদেশ।'

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'এই জাতির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। তারুণ্য ও সৃজনশীলতা আমাদের শক্তি। এই শক্তি আর সুযোগ আমাদের আছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা আর দাসত্বের মধ্যে থাকতে চাই না।'

শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ভিসা জটিলতা দূর করার নির্দেশ

বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা দ্রুত নিরসনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, 'কিছু কিছু দেশে আমাদের ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা রয়েছে, যা আগের সরকারের সময় থেকেই চলমান। প্রধান উপদেষ্টা চান, এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক। এ জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অতিরিক্ত উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।'

শফিকুল আলম জানান, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের নতুন শ্রমবাজার তৈরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সফরে প্রধান উপদেষ্টা কসোভো ও আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং কসোভোর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় শ্রমিক নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়েছেন। তবে এসব দেশে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস না থাকায় ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

প্রেস সচিব বলেন, অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের ভিসার জন্য নয়াদিল্লিতে গিয়ে আবেদন করতে হয়। প্রধান উপদেষ্টা চান, এসব জটিলতা দ্রুত দূর হোক।

ব্রিফিংয়ে শফিকুল আলম জানান, বৈঠকে ফার্মাসিউটিক্যালস, পোশাক ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের নেতারা অংশ নেন। সেখানে আমদানি নীতি, গ্যাস সরবরাহ, ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ, আইসিটি খাতের প্রণোদনা, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ নানা বিষয় আলোচিত হয়।

বিশেষভাবে ব্যবসায়ী নেতারা গ্যাস সরবরাহ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ম্যানমেড ফাইবারসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ধারাবাহিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্য রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট সম্প্রসারণসহ নতুন ল্যান্ড বেস টার্মিনাল স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়। তাঁরা উল্লেখ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রেস সচিব আরও বলেন, মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলছে। দর-কষাকষির সক্ষমতা বাড়াতে সরকার এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কাজ করছে।

বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দেশের ব্যাংকিং খাত, মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, রিজার্ভ এখন পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান এবং মুদ্রাস্ফীতি ১২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমে ৮ দশমিক ৩ শতাংশে নেমেছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, কৃষি উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকীন আহমেদ এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আবদুল মুক্তাদির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রোম যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ১২ অক্টোবর ইতালির রোম সফরে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে যোগ দেবেন।

প্রথম আলো

যুক্তরাষ্ট্র

মামলাবাজ ট্রাম্পের ‘আইনি যুদ্ধ’ কার স্বার্থে

মাইকেল বার্লি

ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমির বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে একপ্রকার ‘আইনি যুদ্ধ’ শুরু করেছেন। এতে তাঁর শাসনব্যবস্থাকে অনেকেই ১৯৩০-এর দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনের সঙ্গে তুলনা করছেন। কারণ, হিটলারও কিন্তু আইন মেনে ক্ষমতায় এসে পরে সেই আইনের জোরেই একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন।

তবে হিটলারের সঙ্গে ট্রাম্পের পার্থক্যও আছে। হিটলার যুদ্ধের ফ্রন্টে লড়েছিলেন, আহতও হয়েছিলেন দুবার। কিন্তু ট্রাম্প সামরিক দায়িত্ব এড়িয়ে যান, দাবি করেন তাঁর পায়ের হাড়ে সমস্যা আছে। তাঁর চোখে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া মানে ‘বোকা’ বা ‘পরাজিত’ হওয়া।

ট্রাম্পের রাজনীতির আসল কৌশল হলো নিজেকে অবহেলিত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান সংখ্যাগোষ্ঠীকে ‘অবহেলিত সংখ্যালঘু’ হিসেবে উপস্থাপন করেন। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদেরও তিনি ‘শরণার্থী’ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানান। কিন্তু এখন তাঁর বক্তৃতাগুলো ক্রমেই অর্থহীন বকবকানিতে পরিণত হয়েছে। হিটলার অন্তত এসব বকবক নিজের ব্যক্তিগত ‘টেবিল টক’-এর মধ্যে রাখতেন, যেখানে তিনি স্পার্টানদের স্যুপ নিয়ে আলোচনা করতেন। ট্রাম্প কিন্তু হাজারো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বাতাসচালিত টারবাইন কীভাবে পাখি ও তিমি মেরে ফেলে—এসব নিয়ে বক্তৃতা দেন।

ট্রাম্প কখনো অপমান ভুলে যান না। সম্প্রতি কোমির পাশাপাশি তাঁর নিশানায় এসেছেন জর্জ সোরোস। তাঁর বিরুদ্ধে তিনি ‘দেশে সন্ত্রাসে অর্থায়নের’ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ তাঁরই সাবেক অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বহু বছর সোরোসের কর্মচারী ছিলেন। এমনকি তিনি সেনাপ্রধান মার্ক মিলিকেও মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ভাষা এখন তাঁর মুখে আরও ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে।

ট্রাম্প আসলে বহু বছর ধরেই ‘ল’ফেয়ার’ বা আইনি যুদ্ধের কৌশল ব্যবহার করে আসছেন। ১৯৭৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তিনি ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী, কর কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক বা সমালোচকদের বিরুদ্ধে প্রায় ৪ হাজার মামলা করেছেন। তাঁর কৌশল সহজ : প্রতিপক্ষকে ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ক্লান্ত করে দেওয়া। অনেক আইনজীবীকেও তিনি পরে নিজের পাওনা টাকার জন্য মামলা করতে বাধ্য করেছেন।

এই মামলাবাজি দিয়ে ট্রাম্প ছোট ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর, এমনকি রংমিস্ত্রিদেরও ঠকিয়েছেন। অনেক বড় আইন সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি সরকারি চাপে রেখেছেন। যদি তারা ‘ভুল’ মক্কেলের পক্ষে দাঁড়ায় বা ভিন্নমতাবলম্বী অধ্যাপক নিয়োগ দেয়, তাহলে তিনি তাদের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নেন। এখন ট্রাম্প নির্বাচিত মেয়র ও গভর্নরদের মত উপেক্ষা করে লস অ্যাঞ্জেলেস, পোর্টল্যান্ড ও মেমফিসে সেনা পাঠাচ্ছেন। মুখোশধারী ফেডারেল এজেন্টরা কৃষি ও মাংসশিল্পে কাজ করা অভিবাসীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর বাজেট এখন বিশ্বের ১৭তম বৃহৎ সামরিক বাহিনীর সমান। তবু ট্রাম্প চান নিয়মিত সেনাবাহিনীও এসব অভিযানে যুক্ত হোক। সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার কোয়ান্টিকো ঘাঁটিতে জেনারেলদের সমাবেশে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তাঁদের বলেন, ‘ওজন কমাও, দাড়ি কামাও, এবং ওয়োক (প্রগতিশীল) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হও।’ তাঁর বেআইনি নির্দেশেই ক্যারিবীয় সাগরে তথাকথিত ‘ড্রাগ বোট’-এর যাত্রীদের হত্যা করা হয়েছে।

এই বেআইনি সংস্কৃতি একধরনের লোভ ও দুর্নীতির দ্বারা চালিত হচ্ছে। হিটলার নিজে সম্পদের লোভে অন্ধ ছিলেন না। কিন্তু ট্রাম্প প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের, তাঁর পরিবারের ও ঘনিষ্ঠদের জন্য অর্থ উপার্জন করছেন।

ট্রাম্পপন্থী ধনকুবের ইলন মাস্ক ও ল্যারি এলিসন সরকারি চুক্তি থেকে বিপুল সম্পদ গড়েছেন। তাঁর নিযুক্ত বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ উপসাগরীয় অঞ্চলে গিয়ে নিজের বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন। সঙ্গে আছেন তাঁর ছেলে অ্যালেক্স উইটকফ। অ্যালেক্স আবার ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্পের সঙ্গে ক্রিপ্টো ব্যবসায় অংশীদার। এই উদ্যোগে অর্থ দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এমনকি মেলানিয়া ট্রাম্পও নিজের জীবন নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরির জন্য জেফ বেজোসের কাছ থেকে ২ কোটি ৮০ লাখ ডলার পাচ্ছেন।

এই প্রকাশ্য দুর্নীতিও ট্রাম্পের ভোটারদের বিচলিত করছে না। কিন্তু বাকিদের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন : আমরা কি ট্রাম্পের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ধ্বংসের পথে সহযোগী হব, নাকি দেরি হওয়ার আগেই কথা বলব?

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

এখন একটাই প্রশ্ন : আমরা কি ট্রাম্পের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ধ্বংসের পথে সহযোগী হব, নাকি দেরি হওয়ার আগেই কথা বলব?

● **মাইকেল বার্লি** সিনিয়র ফেলো, এলএসই আইডিয়াস, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

বিশ্বের নজর জাপানের নারী নেতৃত্বের ওপর

অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড

আ ন্ত র্জা তি ক

জাপানের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব নির্বাচনকে দেশটির অভ্যন্তরে বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। বৃহত্তর বিশ্বও এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা নিবিড়ভাবে নজরে রেখেছে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর জি৭ মিত্ররা। শিল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে গঠিত এই ক্লাবে টোকিওর গুরুত্বই এ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। 'ঐতিহাসিক' শব্দটি অতি ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সত্যিই সেই তাৎপর্য বহন করে। এটা এ কারণে নয় যে, শনিবার ঘোষিত বিজয়ী সানাই তাকাইচি এখন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে ব্যাপকভাবে আশা করা হচ্ছে। যেহেতু টোকিওতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়িয়ে এলডিপি এবং জোটের অংশীদার কোমেইতো সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, নতুন এলডিপি নেতা তাকাইচিকে অন্যান্য দলের আইনপ্রণেতাদের সম্মতিতে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ভোটে জয়ী হতে হবে।

নেতৃত্বে এই পরিবর্তন জাপানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বৃহত্তর বিশ্ব টোকিওর ঘটনাবলিও গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দীর্ঘস্থায়ী মিত্ররা, যাদের সঙ্গে এশিয়ার বড় অর্থনৈতিক দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বে টোকিওর ভূমিকার নেপথ্যে রয়েছে যুদ্ধ-পরবর্তী তাদের অসাধারণ ব্যবসায়িক সফলতা। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতি অঙ্গীকারের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেড়েছে। আজও জাপান বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে একটি। তা ছাড়া আগামী বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী টেকসই প্রবৃদ্ধির নতুন তরঙ্গ সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জাপান কেবল জি৭-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নয়, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সঙ্গে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়াড্রিলেটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ (কোয়াড)-এরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। যদিও এই ফোরামটি শুরু হয়েছিল নিরাপত্তা বলয়কে কেন্দ্র করে; কিন্তু এখন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীরা এখানে বৈঠকে বসেন, যেখানে এজেন্ডা হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা, সর্বনিম্ন দূষণযুক্ত শক্তি ও মানসম্পন্ন অবকাঠামো। অর্থনৈতিক দিক থেকে টোকিও ও ওয়াশিংটন জুলাই মাসে একটি শুল্ক চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যার বিনিময়ে জাপানি পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এর বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ ও ঋণের প্যাকেজ আসবে ৫৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

> নেতৃত্বে এই পরিবর্তন জাপানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বৃহত্তর বিশ্ব টোকিওর ঘটনাবলিও গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দীর্ঘস্থায়ী মিত্ররা, যাদের সঙ্গে এশিয়ার বড় অর্থনৈতিক দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ইউরোপেও জাপানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইইউ ও জাপান গত জুলাই মাসে তাদের ৩০তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে, যেখানে ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন ও বিদায়ী জাপানী প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা উপস্থিত ছিলেন। এই বিশাল অনুষ্ঠানে দুই শক্তি বাণিজ্য, সবুজ ও ডিজিটাল উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন প্রতিযোগিতামূলক জোটের সূচনা ঘটিয়েছে। অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে– কাঁচামাল ও ব্যাটারির সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণ, নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত সহযোগিতা এবং হাইড্রোজেন, তরল



প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রাকৃতিক জ্বালানি ও সেমিকন্ডাক্টরগুলোতে যৌথভাবে কারখানা গড়ে তোলা।

যদিও ইউরোপীয় কোনো দেশ কোয়াডের অংশ নয়, তবুও অনেক আঞ্চলিক রাজনীতিবিদ জাপানের সঙ্গে সম্পর্ককে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একটি কৌশলগত দিক হিসেবে দেখছেন। অতীতে সম্পর্কগুলো অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ফলে বর্তমান পরিবর্তনটি গুরুত্বপূর্ণ। ইশিবার পূর্বসূরি ফুমিও কিশিদা হলেন প্রথম জাপানি প্রধানমন্ত্রী, যিনি ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের 'ফাইভ আইজ' জোটের মতো বৃহত্তর পশ্চিমা গোয়েন্দা ফোরামেও টোকিওকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা শোনা যাচ্ছে।

এই জোরালো নিরাপত্তা বলয়ের একটি ভালো উদাহরণ হলো ২০২৩ সালের যুক্তরাজ্য-জাপান রেসিপ্রকাল অ্যাকসেস এগ্রিমেন্ট, যা ১৯০২ সালের পর থেকে শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি। এই চুক্তি যুক্তরাজ্য ও জাপানের সশস্ত্র বাহিনীকে একটি অপরটিকে নিজেদের দেশে মোতায়েন করার অনুমতি দেয়। এটি ব্রেক্সিট-পরবর্তী যুক্তরাজ্য-জাপান বাণিজ্য চুক্তি, যা কমপ্রিহেনসিভ অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ এগ্রিমেন্ট ফর ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপে (সিপিটিপিপি) যুক্তরাজ্যের প্রবেশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। যার পরিমাণ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের ১০ শতাংশেরও বেশি এবং সব মিলিয়ে এর জনসংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি।

টোকিও ও ব্রাসেলস ঘোষণা দিয়েছে, ২০২৬ সালে একটি নতুন 'প্রতিরক্ষা শিল্প সংলাপ' শুরু হবে। এটি সাইবার নিরাপত্তা, সামুদ্রিক ও মহাকাশ নিরাপত্তাসহ বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপক সহযোগিতার পাশাপাশি উন্নত ও দ্বৈত ব্যবহার প্রযুক্তিতে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে। এই উন্নয়নগুলো ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পশ্চিমা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রজ্ঞাকেই তুলে ধরে, যখন জাপানকে আনুষ্ঠানিকভাবে জি৭ ক্লাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ২০২০-এর দশকের মাঝামাঝি একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এখন একই রকম দূরদর্শী ও কৌশলগত পদ্ধতি প্রয়োজন।

■ **অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের এলএসই আইডিয়াজ-এর সহযোগী; আরব নিউজ থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম**

প্রথম আলো

আইসিটি আইন সংশোধন

অভিযুক্ত সবাই কি দোষী বলেই সাব্যস্ত হবেন



উম্মে ওয়ারা



জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-কে সময়োপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এর বেশ কিছু ধারা ইতিমধ্যে সংশোধিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ অক্টোবর আইনটির ধারা ২০-বি এর পর নতুন একটি ধারা ২০-সি সংযোজন করে আইন মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

নতুন এই ধারার উপধারা (১)-এ বলা হয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল হলেই তিনি আর জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এমনকি তিনি কোনো সরকারি চাকরিও করতে পারবেন না। এতে আরও বলা হয়, উপরিউক্ত উপধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো ব্যক্তি অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হলে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে একই সময়ে। আর তা হলো দল হিসেবে আওয়ামী লীগের 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' বিচারের জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্তও শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'ইতিমধ্যে একজন কর্মকর্তাকে এ অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্তে অন্য দলের নাম এলে তাদের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ১৯৭৩ সালের আইনের সংশোধন ও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুর ঘটনা দুটির আইনি ও রাজনৈতিক তাৎপর্য আলোচনার দাবি রাখে।

একটি আইনকে সময়োপযোগী করার জন্য তা সংশোধন করা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে। তবে নতুন সংশোধনটির যে অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন, তা হলো 'আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল' হলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে' অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া ও সরকারি চাকরি করতে না দেওয়ার শাস্তি দেওয়া। আসুন দেখি রায় ও সাজা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ১৯৭৩ সালের আইনটিতে কী বলা আছে। ধারা ২০(১)-এ কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ বা নির্দোষতার বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ে তার ভিত্তির কারণ উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ধারা ২০(২)-এ কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর, ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড বা অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো শাস্তি দেবে, যা ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়সংগত এবং যথাযথ বলে মনে হয়। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলেই কেবল তাঁকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

শুধু তা-ই নয়, অভিযোগ প্রমাণের সপক্ষে কারণও উল্লেখ করতে হবে। নতুন সংশোধিত ২০সি ধারাটি যৌক্তিকভাবেই উপরিউক্ত ২০(১) ও ২০(২) ধারা দুটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা, নতুন ধারাটিতে অভিযোগ প্রমাণের আগেই শাস্তি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

স্ব-আইনের অন্যান্য ধারার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি সংশোধিত নতুন ধারাটি আইনের নির্দিষ্ট একটি মৌলিক নীতির পরিপন্থীও বটে, যা প্রিজামশন অব ইনোসেন্স বা 'নির্দোষতার অনুমান' হিসেবেই পরিচিত। এই আইনি নীতি অনুসারে, যেকোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হচ্ছে, 'সন্দেহাতীত'ভাবে অভিযোগ প্রমাণ করা না গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এমনকি খালাসও পেতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা রোম সংবিধির ধারা ৬৬-তেও এই নীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তির (আইসিসিপিআর) ধারা ১৪(২) এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ধারা ১১(১) অনুযায়ী নির্দোষতার অনুমান একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি অনুমোদন করেছে এবং ইউডিএইচআরের নীতিগুলোর প্রতিও প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। এই নীতি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (আইএইচএল) একটি মূল নীতি হিসেবে উল্লেখিত আছে। তাই আইনিভাবে ও নীতিগতভাবে নির্দোষতার অনুমানের ধারাগুলো মেনে চলা বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক বলা যায়।

আমরা যদি বাংলাদেশের সংবিধানের দিকে তাকাই, সেখানে নতুন দণ্ড প্রবর্তনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে। সংবিধানের ৩৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে '...অপরাধ সংঘটনের সময় বলবৎ আইনের অধীন যা দণ্ডিত হতে পারত, তার চেয়ে বেশি বা ভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে না।' এবং অনুচ্ছেদ ২৬(১) অনুযায়ী, এই অংশের বিধানাবলির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ যেকোনো আইনের ধারা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে অপরাধ সংঘটনকালে সংশ্লিষ্ট আইনে যে সাজা বা দণ্ডের কথা বলা আছে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো দণ্ড দেওয়া যাবে না কোনো ব্যক্তিকে। এটি আবার সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে, অনুচ্ছেদ ২৬(১)-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

অথচ ১৯৭৩ সালের আইনের নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে যে অভিযোগ দাখিল হলেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন ও শাস্তি পাবেন; কিন্তু বিচারকাজ শেষে যদি প্রমাণিত হয় যে কোনো একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ, যাঁকে ইতিমধ্যে ধারা ২০-সির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সেটি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক ও মানবাধিকার পরিপন্থী হবে বলে মনে করি। নাকি এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে অভিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি দোষী বলেই সাব্যস্ত হবেন? তাহলে সেটি হবে মিসক্যারেজ অব জাস্টিস বা বিচারিক ভুলের অনুপম উদাহরণ।

১৯৭৩-এর আইনের ধারার এই সংশোধনীর একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই যে এই নতুন ধারার সংযোজন করা হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে রাজনৈতিক কারণে আইনকে ব্যবহারের উদাহরণ এই প্রথম নয়। আগের বিভিন্ন সরকারের আমলেও আইনের রাজনীতিকরণের সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ। তাহলে অভ্যুত্থানের 'নতুন বন্দোবস্তের' চেতনা কি এক বছরেই হারিয়ে গেল? বাংলাদেশের মানুষ কি এবারও এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেল না?

পরিশেষে বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন সংশোধনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়া এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের আনুষ্ঠানিক তদন্তের শুরু কাকতালীয় কোনো সিদ্ধান্ত কি না, ভেবে দেখা দরকার। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, পরবর্তী সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ব্যাপারেও তদন্ত হওয়ার আভাস দিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই যদি এই উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়ে থাকে, তবে আইনি জগতের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও জনগণের কাঠগড়ায় ঠিকই দাঁড় করাবে।

● **উম্মে ওয়ারা** সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** মতামত লেখকের নিজস্ব*

বাংলাদেশে এআই আইনের শূন্যতা ভয়াবহ হতে পারে

প্রান্ত চ্যাটার্জী



গানপাউডার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রকে রক্তাক্ত করেছে। পারমাণবিক শক্তি অফুরন্ত বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আবার মানবজাতিকে করেছে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত। এখন সেই একই দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই



মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাস আসলে একই ধরনের বৈপরীত্যে ছায়াময় হয়ে আছে। প্রতিটি আবিষ্কারই একদিকে আমাদের মুক্তির স্বপ্ন বুনেছে, অন্যদিকে আবার ধ্বংসের হুমকিও ডেকে এনেছে। আগুন আমাদের গুহাকে উষ্ণ করেছে, আবার একই আগুন গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। গানপাউডার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রকে রক্তাক্ত করেছে। পারমাণবিক শক্তি অফুরন্ত বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আবার মানবজাতিকে করেছে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত। এখন সেই একই দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এ একদিকে আমাদের কল্পনার আয়না, অন্যদিকে আমাদের উৎকণ্ঠার দূত। বাংলাদেশের মতো এক দেশ, যে আজ স্বপ্ন আর দুর্বলতার মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য প্রশ্নটা আর এটা নয় যে এআই সমাজকে বদলাবে কি না। প্রশ্ন হলো আমরা কি এআইকে নিয়মহীনভাবে, দূরদৃষ্টি ছাড়াই, নৈতিক দিকনির্দেশনা ছাড়াই আমাদের রূপান্তর করতে দেব?

যখন জিওফ্রি হিন্টন, যাকে বলা হয় এআইয়ের 'গডফাদার', গুগল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সতর্ক করে বললেন এই প্রযুক্তি 'মানবজাতির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে', সেটা নিছক একজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি ছিল না। সেটা ছিল এক নির্মাতা যখন নিজের সৃষ্টির ভয়াল দিক দেখে অস্বস্তি বোধ করলেন তার স্পষ্ট প্রকাশ। ঠিক যেমন আলফ্রেড নোবেল ডায়নামাইট আবিষ্কার করেছিলেন নির্মাণকাজ সহজ করার জন্য, কিন্তু পরে দেখলেন সেটা যুদ্ধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে এ প্রতিভাবানদের উজ্জ্বলতা নয়, বরং তাদের অনুশোচনার বিনয়ই আমাদের শেখায়। যারা সিস্টেম তৈরি করেছেন তারা যদি সতর্ক করেন, তাহলে যারা কেবল ব্যবহার করি তাদের সতর্কবার্তাকে আরো গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়?

বাংলাদেশ আজ সেই কঠিন মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এআইয়ের প্রতিশ্রুতি সীমাহীন। এটি শিল্প খাতে স্বয়ংক্রিয়তা আনতে পারে, চিকিৎসায় ত্বরান্বিত ডায়াগনসিস দিতে পারে, কৃষিকে বিপ্লবীভাবে বদলাতে পারে, এমনকি লাখ লাখ মানুষকে শিক্ষার আলো দিতে পারে যারা এখনো শ্রেণিকক্ষের বাইরে। কিন্তু এর ভয়াবহতাও সমান গভীর। নিয়ন্ত্রণহীন থাকলে এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভেঙে দিতে পারে, বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, বৈষম্য বাড়াতে পারে, আর দুর্বল মানুষকে বিশেষ করে নারীকে অপমানের শিকার করতে পারে ডিপফেক বা ভুয়া কনটেন্ট দিয়ে। প্রযুক্তি নিরপেক্ষ নয়। এটা প্রতিভাকে যেমন বাড়িয়ে দেয়, নিষ্ঠুরতাকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২০২৪ সালে সরকার একটি খসড়া জাতীয় এআই নীতি প্রকাশ করেছে। সেখানে সমতা, জবাবদিহি, টেকসই উন্নয়ন, নিরাপত্তা আর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার মতো নীতিগত কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নীতি আর আইন এক জিনিস নয়। নীতি আসলে প্রতিশ্রুতি, যার বলপ্রয়োগ নেই। এই সময়ে, বাংলাদেশের বাইরের এআই দুনিয়া দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম সমন্বিত এআই আইন করেছে, যেখানে ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে আর অপরাধীদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল নিজেদের আইন করেছে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করছে। যুক্তরাজ্য প্রকাশ করেছে এআই হোয়াইটপেপার। এগুলো নিখুঁত নয়, কিন্তু একটা বিষয় প্রমাণ করে যে শাসন কাঠামো আবিষ্কারের পিছনে পড়ে থাকতে পারে না। অথচ বাংলাদেশ এখনো আলোচনার স্তরে, আর প্রযুক্তির ঢেউ প্রতি মাসে আরো দ্রুত বেগে বইছে।

ঝুঁকিগুলো নিছক কল্পনা নয়। আগে যে ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফরমগুলোতে বাংলাদেশিরা রাজত্ব করত, সেখানে এখন এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় এজেন্টরা কাজ করছে অনুবাদ, ট্রান্সক্রিপশন, ডেটা এন্ট্রি অনেক দ্রুত আর সস্তায়। আমাদের তরুণদের গর্বের আইটি সেক্টরই থমকে যাবে যদি আমরা এআইকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখি, সহযোগী হিসেবে নয়। অথচ আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো আঁকড়ে আছে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, যেখানে বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীরা এআইকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিরোধ আসলে কেবল সতর্কতা নয়, বরং কর্মীদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ না করার অজুহাত, গবেষণায় অর্থ না ঢালার অজুহাত, আর অজানাকে সামনে দাঁড় করাতে ভয় পাওয়ার মানসিকতা। এরকম আত্মতুষ্টি আমাদের তরুণ প্রোগ্রামারদের বৈশ্বিক আলোচনার বাইরে ঠেলে দিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রেও সংকট কম নয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এআই গবেষণার আসল কেন্দ্র হওয়ার কথা, তারা অনেক সময় ল্যাবরেটরির ন্যূনতম অবকাঠামো দিতে হিমশিম খায়। সমস্যা কেবল বাজেট নয়, দৃষ্টিভঙ্গিরও।

তাই আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা এখন আর বিলাসিতা নয়, বেঁচে থাকার আবশ্যকতা। আইন সব ঝুঁকি সরাতে পারবে না, কিন্তু অন্তত এমন সীমানা টানতে পারবে যা নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করবে আর উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এআই কাঠামোর মূল হতে হবে তথ্যের সার্বভৌমত্ব। যে দেশ নিজের ডেটার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, সে আসলে নিজের ভবিষ্যতের ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। আন্তর্জাতিক করপোরেশনগুলোকে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা বাংলাদেশি ডেটা দেশের ভেতরেই প্রক্রিয়াকরণ করে এবং স্থানীয় গবেষণায় বিনিয়োগ করে। যারা এআই ব্যবহার করে প্রচারণা ছড়াবে, প্রতারণা করবে বা ক্ষতিকর কনটেন্ট বানাবে তাদের জন্য শাস্তি হতে হবে কঠোর। আর এই আইন হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে, যাতে সেটা রাজনৈতিক হাতিয়ার না হয়ে ওঠে, যেমনটা আমরা আইসিটি আইনের ক্ষেত্রে দেখেছি।

প্রথম ধাপ হতে পারে পূর্ণাঙ্গ আইন নয়, বরং একটি হোয়াইটপেপার। যেখানে সরকার, শিল্প খাত, বিজ্ঞানী, একাডেমিক আর সিভিল সোসাইটি সবাই মিলে আলোচনা করে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা দাঁড় করাবে। তাতে থাকবে তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আবার দীর্ঘমেয়াদি ভিশনও। সেই নকশা থেকেই তৈরি হতে পারে একটি আসল এআই আইন, যা দৃঢ়, কার্যকর এবং জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে, কিছু অভিজাতের উৎকণ্ঠার প্রতিধ্বনি নয়।

কিন্তু আইন করলেই হবে না। আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের চারপাশে একটা নৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে হবে। এআইয়ের সবচেয়ে বড় ভয় কেবল এই নয় যে মেশিন মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে, বরং মানুষই এটিকে অপব্যবহার করবে এমনভাবে যে বিশ্বাস, সহানুভূতি আর সত্য হারিয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণহীন থাকলে এআই তৈরি করা মিথ্যা তথ্য গণতান্ত্রিক বিতর্ককে বিষাক্ত করতে পারে, নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারে, এক রাতেই কারো সুনাম ধ্বংস করে দিতে পারে। এমনকি পুরোপুরি এআই-চালিত আর্থিক প্রতারণা পরিবার ও ছোট ব্যবসাকে দেউলিয়া করে দিতে পারে। মানববিশ্বাসের ভঙ্গুরতাই হবে প্রথম শিকার।

এখানেই আসল দার্শনিক প্রশ্ন। প্রযুক্তি আমাদের জিজ্ঞাসা করে না আমরা প্রস্তুত কি না। ও এগিয়ে চলে নিজস্ব ছন্দে। প্রশ্ন হলো আমাদের নৈতিক কল্পনা কি সেই গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারবে? দার্শনিক হান্স জোনাস বলেছিলেন, মানবশক্তি যত বাড়বে, আমাদের নৈতিক দায়িত্বও তত বাড়তে হবে। নৈতিক কাঠামো ছাড়া এআই গ্রহণ করা মানে ধ্বংসকে স্বাগত জানানো। বাংলাদেশ, যেটা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রান্তে দাঁড়িয়েও তার অভিঘাতে জড়িত, তাকে আর দেরির ফাঁদে পড়া চলবে না। কারণ দেরি মানে নিরপেক্ষ থাকা নয়। দেরি মানে জড়িত থাকা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এখন সুযোগ আছে এ যাত্রা শুরু করার। যদি সব রাজনৈতিক দল একমত হতে পারে যে এআই আইন জাতীয় টিকে থাকার প্রশ্ন, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, তাহলে হয়তো আমরা অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল আইন তৈরির ভুলগুলো এড়াতে পারব। আজকের বহু-পক্ষীয় ঐকমত্যই হয়তো নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ ডিজিটাল শতকে সাফল্যের মুখ দেখবে, নাকি চিরন্তন নির্ভরতায় পিছিয়ে থাকবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। সেটা ঢুকে পড়বে শ্রেণিকক্ষে, বাজারে, হাসপাতালে, নিউজফিডে, আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও। প্রশ্ন হলো আমরা কি সাহস আর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানাব, নাকি দ্বিধা আর অনুতাপ নিয়ে পিছিয়ে থাকব। ইতিহাস ক্ষমা করবে না সেই দেশকে, যে এই শতাব্দীর সবচেয়ে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিকে গুরুত্বহীন ভেবেছিল। যদি আমরা এখনই পরিষ্কার, বুদ্ধিদীপ্ত আর জরুরি আইনি কাঠামো তৈরি করতে না পারি, তাহলে আমরা প্রযুক্তির লেখক নয়, কেবল তার প্রজাই হয়ে থাকব।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আজ কোড হয়ে যাচ্ছে কেবল বিদেশি ল্যাবরেটরিতেই নয়, বরং দেশের ভেতরে আইন না থাকার কারণেও। এআই নিয়ন্ত্রণ মানে উদ্ভাবনকে থামানো নয়, বরং তাকে ন্যায়, মর্যাদা আর অগ্রগতির দিকে চালনা করা। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখনই আমাদের নিয়ম লিখতে হবে। নইলে নিয়ম লিখে দেবে অন্যরা। আর তার ফলাফল থেকে পালানোর কোনো উপায় আমাদের হাতে থাকবে না।

● লেখক : ইতালির ইউনিভার্সিটি অফ নেপলসের অটোনোমাস ভেহিকল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েশন শিক্ষার্থী

শেয়ার বিজ

ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ : সংস্কার প্রক্রিয়ার ইসলামসম্মত আধুনিক রূপ

মো. খায়রুল হাসান



দেশের ব্যাংক খাতের বর্তমান বিপর্যস্ত পরিণতি সচেতন ও বিবেকবান প্রত্যেক মানুষকেই ভাবায়। বিশেষ করে ব্যাংকার, গ্রাহক ও খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনের আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ব্যাংক খাতের বিদ্যমান বিপর্যয়ের কারণে অনেক গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারের জীবন আজ বিপর্যস্ত। অনেক আমানতকারী ও উদ্যোক্তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে। অনেক গ্রাহক তাদের কষ্টার্জিত জমানো অর্থ ফেরত না পেয়ে হতাশা ও আতঙ্কে দিনাতিপাত করছেন। নিরবচ্ছিন্ন অর্থপ্রবাহের অভাবে দেশে শিল্পায়ন, উৎপাদন, কর্মসংস্থানসহ সব ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা চলছে। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন এই বিপর্যয় : কারও অজানা নয়, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বাংলাদেশের আর্থিক ও ব্যাংক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম, লাগামহীন দুর্নীতি এবং অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার কারণে এই সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সরকারের মদতপুষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী যেমন এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ ও নাসা গ্রুপের মতো বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর নামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটপাট এবং ঋণ হিসেবে নিয়ে এগুলো বিদেশে পাচার করে। ফলে পরে এসব ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হয়। খেলাপি ঋণের পরিমাণ আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। অনেকগুলো ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে ভুগছে। ব্যাংকগুলোয় তারল্য সংকটের কারণে গ্রাহকদের আস্থার সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ব্যাংক খাতের সুশাসনের চরম অবনতি এবং ভয়াবহ অব্যবস্থাপনার ফলে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় 'সিস্টেমিক রিস্ক' বা পদ্ধতিগত ঝুঁকি তৈরি হওয়ার পথে।

উত্তরণে করণীয় : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যাংক খাতের সংস্কার, পুনর্গঠন, গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা এবং এই খাত ধ্বংসের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে এ বছর ৯ মে 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করে। দেশের আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝা, ব্যাংকগুলোর চরম দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক সুশাসনের ঘাটতির মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে এই অধ্যাদেশকে একটি অপরিহার্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। একজন সচেতন ব্যাংকার হিসেবে এই রেজল্যুশনটি আমার ভেতরে এক গভীর ভাবনার খোরাক জোগায়। আধুনিক এই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক রেজল্যুশনের ঐতিহাসিক ভিত্তি কী এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে এর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কি না?

পবিত্র আল কোরআনের বহু স্থানে বিশেষ করে সুরা নুহ, সুরা হুদ, সুরা আল-আ'রাফ, সুরা আল-আহকাফ, সুরা আল-হিজর এবং সুরা আশ-শু'আরাতে বিভিন্ন জাতির অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যখনই কোনো জাতি তাদের নবীকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর বিধানকে উপহাস করেছে এবং সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখনই তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে এসেছে। তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, পুনর্গঠন করা হয়েছে অথবা তাদের ওপর অন্য জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিগত অবাধ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সীমালঙ্ঘন, অবিচার ও অব্যবস্থাপনার পরিণতিতেই যুগে যুগে কোনো সভ্যতা, জাতি বা জনপদ কিংবা ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। তখন এই সমস্ত পতন থেকে বৃহত্তর সমাজকে রক্ষা করার জন্য সময়োচিত হস্তক্ষেপ, ন্যায়বিচার ও পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এভাবে পুনর্গঠিত ও পরিশুদ্ধ অধিবাসীদের হাত ধরে পৃথিবীতে আবার সত্য এবং ন্যায়ের যাত্রা শুরু হয়েছে, যা মানবসভ্যতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছে।

একইভাবে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশটি' বস্তুত কোরআনে বর্ণিত সংস্কার নীতিসমূহেরই একটি আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, যা বছরের পর বছর ধরে চলা পদ্ধতিগত অবক্ষয়, সুশাসনের চরম ঘাটতির জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতন রোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই ভবিষ্যৎ অর্থব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পথনির্দেশ করে। মানবসভ্যতার এই উত্থান-পতন, ধ্বংস, পুনর্গঠন বা মার্জারের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ব্যাংক একীভূতকরণের যৌক্তিকতা বা সাদৃশ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা ও কোরআনের সতর্কবার্তা : আল-কোরআন যেকোনো জাতি, সম্প্রদায় বা শাসনব্যবস্থার পতনের মূল কারণ হিসেবে 'ফাসাদ ফিল-আরদ' (পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি) এবং সামষ্টিক সীমালঙ্ঘনকে চিহ্নিত করেছে। এই বিপর্যয় কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়, বরং একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়। আল-কোরআনে বর্ণিত এই ধরনের বিপর্যয়ের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো—

কওমে শু'আইব ও অর্থনৈতিক আস্থার সংকট : কওমে শু'আইব বা মাদইয়ানবাসীর মূল অপরাধ ছিল অর্থনৈতিক প্রতারণা, বিশেষ করে ওজনে কম দেয়া। এই অপরাধগুলো তাদের ব্যবসায়িক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এটি ছোট অপরাধ মনে হলেও এর গভীরে ছিল পুরো বাজার ব্যবস্থার প্রতি গণ-অনাস্থা তৈরির এক নীলনকশা। একটি অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর। বিশ্বাসই হলো তার অদৃশ্য মুদ্রা বা পেমেন্ট গ্যারান্টি। যখন উৎপাদক, ভোক্তা এবং আমানতকারীদের এই বিশ্বাসে ফাটল ধরে, তখন বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়, যখন তার তথাকথিত মালিক ও পরিচালকরা আমানতকারীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেন, অভ্যন্তরীণ তথ্যের অপব্যবহার করে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির আশ্রয় নেন। এটি আধুনিক আর্থিক জগতে আমানতের খেয়ানতের (ব্রিচ অব ফিডিউসিয়ারি ডিউটি) এক ঐতিহাসিক উদাহরণ, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ভেতর থেকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়।

আদ-সামুদ জাতির 'বেপরোয়া' মানসিকতা : আদ ও সামুদ জাতি নিজেদের শারীরিক শক্তি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সুরক্ষিত অট্টালিকার জন্য অহংকারী ছিল। তারা নিজেদের 'অজেয়' মনে করত। এই মানসিকতা আজকের করপোরেট জগতের (টু বিগ টু ফেইল) ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যখন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান মনে করে, তার পতন হতে পারে না, তখন সে বেপরোয়া ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহিত হয়। এই অহংকার ও আত্মতুষ্টি তাদের বিবেককে ধ্বংস করে দেয়, যা কেবল নিজেদের নয়, বরং পুরো ব্যবস্থাকেই সংকটের মুখে ফেলে দেয়। এই জাতির প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যেমন পাহাড় খোদাই করে বাড়ি বানানো তাদের নৈতিক ও পদ্ধতিগত পতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি, যা প্রমাণ করে যে বাহ্যিক শক্তি নয়, বরং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাই স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি।

ফেরাউন ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরাচার : ফেরাউন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শোষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। সে নিজেকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করত এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করেছিল। এটি এক ধরনের 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'-এর নিকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে একটি ক্ষুদ্র ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শোষণ করে। যখন কোনো ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভেবে আমানতকারীদের অর্থকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে খেলাপি ঋণের পাহাড় গড়ে তোলে, তখন ফেরাউনের মতোই সেই প্রতিষ্ঠানের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ধারা ১৫ অনুযায়ী, যখন কোনো ব্যাংক মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট বা চরম খেলাপি ঋণের কারণে 'অকার্যকর' (নন-ভায়াবল) হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে এই কোরআনের শিক্ষারই একটি আধুনিক প্রয়োগ। এর উদ্দেশ্য হলো, বিপর্যয়কে আর বিস্তৃত হতে না দিয়ে একটি চূড়ান্ত সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয়কে রক্ষা করা।

কোরআনের মডেলে সংকট ব্যবস্থাপনা : কোরআন শিক্ষা দেয় যে, চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বেও আল্লাহ সংশোধনের সুযোগ দেন এবং বিপর্যয়কালে নিরপরাধ ও অপরিহার্য অংশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন।

হজরত নুহ (আ.)-এর কিস্তি ও 'ব্রিজ ব্যাংক' : হজরত নুহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের ঘটনা কোরআনে বর্ণিত একটি নিখুঁত রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার কালজয়ী দৃষ্টান্ত। এখানে কিস্তিটি ছিল মূলত একটি নির্বাচিত 'উদ্ধারকারী ব্যবস্থা' (রেসকিউ ভেহিকল), যা আজকের 'ব্রিজ ব্যাংক'-এর আদিরূপ। এই নৌকায় 'ভালো সম্পদ' (মুমিন ব্যক্তি ও প্রত্যেক জীবের জোড়া) এবং 'খারাপ সম্পদ' (অবিশ্বাসী ও সীমালঙ্ঘনকারী) স্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছিল। উদ্ধারের উদ্দেশ্য কেবল জীবনরক্ষা ছিল না, বরং একটি নতুন ও সুস্থ সমাজের স্বাস্থ্যকর জিনগত উপাদান (হেলদি ডিএনএ) রক্ষা করাও ছিল। এই মডেল অনুসরণ করেই রেজল্যুশন অধ্যাদেশের ধারা ৩০ থেকে ৩২-এ 'ব্রিজ ব্যাংক'-এর ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যর্থ ব্যাংকের কার্যকর সম্পদ ও গ্রাহক পরিষেবা (ভালো সম্পদ) একটি নতুন কাঠামোতে স্থানান্তর করে সাধারণ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা হয় এবং খেলাপি ঋণের মতো 'খারাপ সম্পদ' (টক্সিক অ্যাসেটস) বিলুপ্তির জন্য মূল সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকের কাঠামোতে রেখে দেয়া হয়। ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম এক দিনের জন্যও ব্যাহত হয় না এবং সমাজে আতঙ্ক ছড়ায় না।

হজরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রাক-সংকট ব্যবস্থাপনা : দুর্ভিক্ষের পূর্বে হজরত ইউসুফ (আ.)-এর গৃহীত খাদ্যশস্য মজুত ও সুষম বণ্টনের পরিকল্পনা একটি প্রাক-সংকট (প্রি-এম্পটিভ) ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি সমৃদ্ধির বছরগুলোয় উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয় করে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দূরদর্শী নীতি প্রণয়নের সঙ্গে তুলনীয়, যার মূল লক্ষ্য হলো সংকট আসার পূর্বেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেমন ক্যাপিটাল অ্যাডেকোয়াসি রেশিও, স্ট্রেস টেস্টিং প্রভৃতি গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। হজরত ইউসুফের পরিকল্পনা ছিল ইতিহাসের সফলতম 'স্ট্রেস টেস্ট', যা শিখিয়েছে যে সমৃদ্ধির সময়েই মন্দার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়।

জবাবদিহি ও ন্যায়বিচারে 'বেল-ইন' ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি : কোরআনের অন্যতম মূল শিক্ষা হলো, ব্যবস্থার পতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে, যা একটি সুস্থ সমাজ ও টেকসই অর্থনীতির পূর্বশর্ত। ক্ষমতার অপব্যবহারকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া হলে তা নতুন অপরাধকে উৎসাহিত করে।

ফেরাউনের পরিণতি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি : আল্লাহ ফেরাউনের মৃতদেহকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিদর্শন হিসেবে রক্ষা করার ঘোষণা দেন, যাতে মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। এটি এক ধরনের 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি' (ডেটারেন্স), যা অন্যদের একই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এটি প্রমাণ করে, পৃথিবীতে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং চূড়ান্ত জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই।

এই ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করেই অধ্যাদেশের ধারা ৭৭ থেকে ৮২ পর্যন্ত দায়ী পরিচালকদের চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে। এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিফলন ঘটেছে ধারা ৩৩-এর 'বেল-ইন (বেইল-ইন)' ব্যবস্থায়। এই নীতি অনুযায়ী, ব্যাংকের ব্যর্থতার দায় প্রাথমিকভাবে তার মালিক (শেয়ারহোল্ডার) ও পরিচালকদের ওপর বর্তায়।

এটি প্রচলিত 'বেল-আউট (বেইল-আউট)' ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে জনগণের করের অর্থে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানো হয়, যা সাধারণ মানুষের প্রতি এক চরম অবিচার। 'বেল-ইন' ব্যবস্থাটি ইসলামি ফিকহের সুপ্রসিদ্ধ নীতি 'আল-গুনমু বিল-গুরম'-এর (লাভের সঙ্গে ঝুঁকির দায়ও জড়িত) একটি বাস্তব প্রয়োগ। এর অর্থ হলো, যারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ভোগ করেছেন, তাদেরই লোকসানের দায় প্রথমে নিতে হবে। এটি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' আধুনিককালে মানবরচিত একটি সংস্কার আইন হলেও এটি মূলত সেই শাশ্বত কোরআনের নীতিমালারই একটি প্রায়োগিক প্রতিফলন। সীমালঙ্ঘনের পরিণতি রোধ করা, সংকটকালে অপরিহার্য অংশকে রক্ষা করা, দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং একটি নতুন ও টেকসই পদ্ধতির সূচনা নিশ্চিতকরণ—এই প্রতিটি নীতি ও পদ্ধতি কোরআনে বর্ণিত কালজয়ী ঘটনাসমূহে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে, যা থেকে আমরা সমকালীন সংকট উত্তরণের জন্য শিক্ষা নিতে পারি। সুতরাং, এই অধ্যাদেশটি কেবল একটি আর্থিক সুরক্ষার আইন নয়, বরং এটি একটি টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণে অপরিহার্য এক পদক্ষেপ, যার ভিত্তি নৈতিকতা ও জবাবদিহির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, একটি স্থিতিশীল অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য আইনের পাশাপাশি নৈতিকতা চর্চার প্রয়োজনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংকার এবং বাহরাইন ভিত্তিক আওফি'র সার্টিফায়েড শরিয়াহ অ্যাডভাইজার অ্যান্ড অডিটর

ব্রি. জেনারেল মো. জাহেদুর রহমান (অব.)

পিআর, তবে এখনই নয়



বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকেই ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সময়ে এ পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসরণের জন্য কিছু দল দাবি জানিয়ে আসছে। আমার মতো আরও অনেক সাধারণ মানুষের নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সীমিত। আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation System) নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা উপস্থাপন করা।

পৃথিবীতে মূল তিনটি নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়; সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক, সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি। এ পদ্ধতিগুলোর যেমন বিভিন্ন ধরন আছে, তেমনি এ পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণে আরও বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এদের বাইরেও গুটিকয়েক পদ্ধতি আছে, যেগুলো মূলধারার বাইরে আঞ্চলিক কিংবা সাংগঠনিক পর্যায়ে অনুসৃত হয়ে থাকে।

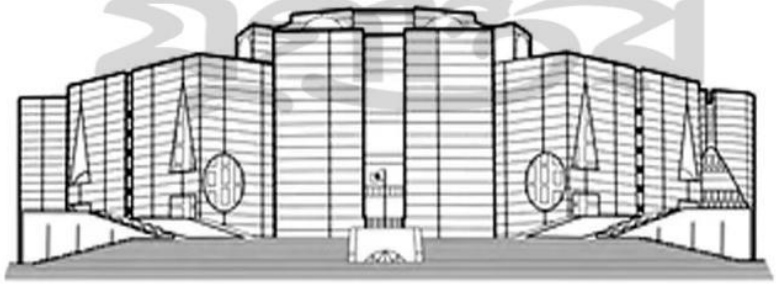
সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সংসদে আসন বরাদ্দের পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ ভাষায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বা সংক্ষেপে পিআর পদ্ধতি। পৃথিবীর ৯৪টি দেশ পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর মধ্যে ৭০টি দেশ কেবলই পিআর এবং ২৪টি দেশ পিআর ও ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির মিশ্রণ অনুসরণ করে। অন্যদিকে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি, যা আমাদের দেশে অনুসরণ করা হয়, তাতে যিনি তার সংসদীয় আসনে সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন, তিনি নির্বাচিত হন।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির বেশ কয়েকটি মডেল আছে। তবে মূলনীতি হচ্ছে ভোটপ্রাপ্তির আনুপাতিক হার। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে :

১. পার্টি লিস্ট আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নির্বাচনের সময়ে ভোটাররা ব্যক্তিকে নয়, দলকে ভোট দেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের আগে তাদের প্রতিনিধির তালিকা দাখিল করে। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলোর মধ্যে আসন বরাদ্দ হয়। এক্ষেত্রে কোন কোন দেশে আসনপ্রাপ্তির মানদণ্ড হিসাবে সর্বনিম্ন নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করা হয়। পার্টি লিস্ট আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি দুই ধরনের হয়। প্রথমটি, ক্লোজড লিস্ট পদ্ধতি, যেখানে ভোটার দলকে ভোট দেন। দল আগে থেকে নির্ধারিত প্রার্থীদের তালিকা থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত আসনে প্রার্থী নির্ধারণ করে। দলের যেমন আগের তালিকা থেকে বিচ্যুতির সুযোগ নেই, তেমন ভোটারদের প্রার্থী পছন্দের সুযোগ নেই। এ পদ্ধতি সহজ, কেননা ভোটার কেবল তার পছন্দের দল নির্বাচন করে। দলের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, কেননা প্রার্থী দলের ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড় এ বিষয়টি প্রাধান্য পায়। দল চাইলে সহজেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নারী ইত্যাদি প্রার্থী তালিকাভুক্ত করতে পারে। এর অসুবিধা হলো, ভোটার তার পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু দলের উপরস্থ নেতারা প্রার্থী তালিকা মনোনয়ন দেয়, সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বৃদ্ধি পেতে পারে। নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের জনগণের কাছে কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। ফলে জনগণের সঙ্গে সংসদ-সদস্যদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। স্পেন, পর্তুগাল, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক ইত্যাদি দেশগুলো এ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ওপেন লিস্ট পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে ভোটার দলকে ভোট দেওয়া ছাড়াও দল থেকে প্রদত্ত তালিকা থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকেও ভোট দেন। দল ভোটের আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসনের জন্য আগে প্রদত্ত তালিকা থেকে প্রার্থী হিসাবে যারা বেশি ভোট পেয়েছে, ক্রমান্বয়ে তাদেরই প্রাপ্ত আসনের জন্য নির্ধারণ করে। নরওয়ে, সুইডেন,



ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ব্রাজিল, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশগুলো ওপেন লিস্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে সুবিধা হচ্ছে ভোটার যেমন তার পছন্দের দল নির্বাচন করতে পারে, তেমনি তার পছন্দের প্রার্থীও নির্বাচন করতে পারে। দলগুলোর তথাকথিত নিয়ন্ত্রকদের প্রার্থী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। প্রার্থীদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। এখানে অসুবিধা হলো, নিজ দলের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং ফলে নির্বাচনসংক্রান্ত প্রচারণা ব্যয়ও বাড়ে। সর্বোপরি এ পদ্ধতিতে গণনা দল ও প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোট বেশ জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

২. একক স্থানান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতি : এ পদ্ধতি অধিকতর জটিল পদ্ধতি। নির্বাচনি এলাকায় যখন একাধিক সংসদ-সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশে একটি নির্বাচনি এলাকায় একজন সংসদ-সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন, সেহেতু এ পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয়।

বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতি অনুসৃত হলে কী সুবিধা হবে

প্রথমত, দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারদের পছন্দের প্রতিফলন ঘটবে। তবে সংসদ-সদস্যের সঙ্গে এলাকার সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সংসদ-সদস্য জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি হয়ে উঠতে অপারগ হবেন। দ্বিতীয়ত, ছোট রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক দল, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শের দল এবং কোনো বিশেষ ইস্যুভিত্তিক দল (যেমন, পরিবেশবাদী, নারীবাদী ইত্যাদি) তাদের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আসন পেতে পারে। এতে সংসদ বৈচিত্র্যময় হবে। তৃতীয়ত, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে আধিপত্য বিস্তার করা কঠিন হয়ে ওঠে। আলোচনা, সমঝোতা এবং জোট প্রয়োজনীয় হয়। এক বা দুটি দলের পক্ষে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, এ পদ্ধতিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল, যারা নারী, গোত্র, গোষ্ঠী কিংবা ধর্ম প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের জন্য অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকগুলো

১. বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠ বহুধাবিভক্ত। এদেশে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৫৫টি তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল আছে। নিখাদ পিআর পদ্ধতি অতিরিক্ত বিভাজন তৈরি করবে, অস্থিতিশীল জোট (কোয়ালিশন) সৃষ্টি করবে এবং ফলে সরকারের মেয়াদকাল ক্ষণস্থায়ী হবে। ঘন ঘন সরকার পতনের ফলে সুষ্ঠু উন্নয়ন ও সেবা থেকে জনগণ বঞ্চিত হবে। সরকার স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর মনোযোগী হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়ার কারণে সার্বিক অগ্রগতি ধীরগতির হতে পারে।

২. জোটবদ্ধতার (কোয়ালিশন) জন্য প্রয়োজন সমঝোতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিপক্বতা ও পূর্ণতা। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনে বিজয়ী সর্বময় অধিকারের প্রাপ্য এ ধারণা ও চেতনা মন ও মননে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দলগুলোর মাঝে আস্থাহীনতা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় অন্তরায়। যার কারণে বিভক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. সংসদে প্রতিনিধিত্বের জন্য ন্যূনতম ভোটপ্রাপ্তির মানদণ্ড যদি খুব কম নির্ধারণ করা হয়, সেক্ষেত্রে উগ্রপন্থি গোষ্ঠী (ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্র) সংসদে আসন পেতে পারে। এর ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাজন ও হুমকির মুখে পড়বে।

৪. যেহেতু পিআর পদ্ধতিতে একাধিক ভোট দিতে হয় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং জনগণ এ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নয়, সেহেতু ভোটারদের ব্যাপকভাবে পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অঙ্গকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৫. একটি নতুন নির্বাচনব্যবস্থার জন্য সংবিধান সংশোধন, নির্বাচনি আইন পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা পর্যালোচনা এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থিক উদ্যোগ।

৬. প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজ নিজ প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমলে নিয়ে নিজেদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি বেছে নিতে হবে, অন্ধ অনুকরণের সুযোগ নেই।

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য আমার প্রস্তাবনা

আগামী সংসদ নির্বাচনে এবং তৎপরবর্তী নির্বাচনগুলো ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা। প্রথম সংসদের মেয়াদকালীন নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে : ১. জনগণের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম (awareness campaign) পরিচালনা করা। সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সব পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা করার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে জনগণের ধারণা পরিষ্কার করা। ২. সংসদে আলোচনা, সংসদের বাইরে সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে কোন পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, সেটি নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা। ৩. সর্বজনস্বীকৃত এবং সংসদে গৃহীত পদ্ধতি 'পাইলট প্রকল্প' হিসাবে নির্দিষ্টসংখ্যক এলাকায় কমপক্ষে পরপর দুবারের জন্য পরিচালনা করে বাংলাদেশের পটভূমিতে তার সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত অসুবিধাগুলো আমলে নিয়ে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। ৪. প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অঙ্গকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির পর যদি জনগণ অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাহলে জনগণের অভিলাষ অনুযায়ী নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়া নতুন পদ্ধতি অবলম্বন দেশকে রাজনৈতিক বিভাজন, সহিংসতা ও অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে।

ব্রি. জেনারেল মো. জাহেদুর রহমান (অব.) : *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ফাউন্ডেশন ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ*

শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি



ড. এম. মেসবাহউদ্দিন সরকার

তথ্যের অবাধ প্রবাহ, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে মানুষের হাতের মুঠোয় এমনভাবে পৌঁছে দিয়েছে যে এগুলো ছাড়া জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু প্রযুক্তির ভালো-মন্দ শিশুরা তেমন বোঝে না। বুঝে না বুঝে মনের অজান্তেই হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারময় ভার্চুয়াল জগতে। মা-বাবা এমনকি স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিমজ্জিত থাকছে এই অন্ধকার জগতে। ফলে বিশাল এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। সংসার সামলাতে বাবা-মায়ের চাকরি করা এখন একটি বাস্তব বিষয়। ফলে অনেক বাবা-মাকে তার সন্তান থেকে দীর্ঘ সময় ধরে দূরে থাকতে হয়। এই সময়টা শিশুর একাকিত্বের একমাত্র সঙ্গী প্রযুক্তি। বাইরে যখন খেলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ নেই তখন মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাব তাদের জীবন সঙ্গী। অর্থাৎ সন্তান তার বাবা-মার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা শিশু অধিকার সনদের পরিপন্থি। মোবাইল ফোনের মধ্যে থাকা ট্রান্সমিটিং ডিভাইস থেকে যে অদৃশ্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ (রেডিয়েশন) নির্গত হয়, তার লেভেল প্রতি কিলোগ্রামে ১.৬ ওয়াটের বেশি হলে মানবদেহে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। দেখা দেয় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'স্ক্রিন অ্যাডিকশন'। গবেষণায় প্রতীয়মান যে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা দিনে পাঁচ থেকে আট ঘণ্টা ডিজিটাল যন্ত্র নিয়ে মেতে থাকছে। ফলে বাইরে বেড়াতে যাওয়া, খেলাধুলা করা, মুখোমুখি বসে আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি সব ধরনের ফেস—টু—ফেস ইন্টার—অ্যাকশনে আগ্রহ কমে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এর ১১তম ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজেস (আইসিডি)-তে স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারে গেম খেলার নেশাকে গেমিং ডিজঅর্ডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে গেমিং আসক্তিকে একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রতিটি পরিবারই আজ চিন্তিত তাদের সন্তানদের আচার-আচরণ ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ে। শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘক্ষণ টিভির পর্দা, মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাবলেটের মতো ছোট স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই এসব গেম নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ, মনোরোগ চিকিৎসক এবং সাইবার বিশেষজ্ঞগণের চিন্তার কোনো অন্ত নেই। কারণ এ ধরনের ভাইরাস গেম হিংসাত্মক আচরণকে প্রশ্রয় দেয়। এমনকি গেমের নিয়ম মানতে গিয়ে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। পাবজির মতো গেম খেলায় শিশুমনে কিরূপ প্রভাব পড়ছে তা কারও অজানা নয়। আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির তিন মনোবিজ্ঞানীর পরিচালিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রেডের এক হাজার ৩২৩ জন ছেলে-মেয়ের ওপর সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব ছেলে-মেয়ে দৈনিক দুই ঘণ্টার বেশি টিভি বা ভিডিও গেম দেখে, তারা গড় হারের দেড় থেকে দুই গুণের বেশি মনঃসংযোগ সমস্যায় পড়ে। শিশু মনোবিজ্ঞানী ডগলাস জেনটাইলের মতে, ভিডিও গেমগুলোতে দ্রুত দৃশ্য বদল, আলো, শব্দ, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের সর্বক্ষণ পরিবর্তন ও কম্পন এমনভাবে হয়ে থাকে যে শিশুদের মনে ও মস্তিষ্কে তা স্থায়ী হয়ে যায়। এই অবস্থায় শিশুরা যখন ক্লাসরুমে যায় তখন সেখানে এ ধরনের কিছু না পেয়ে শিক্ষকের নিরস পাঠদানের প্রতি মনঃসংযোগ থাকে না। ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেটের অজুহাতে লেখাপড়া, খেলা ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে দিনরাত ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার জগতে।

ইংল্যান্ডে শিশু বিশেষজ্ঞ স্যালি পেইন তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন ডিজিটাল ট্যাব এবং স্মার্ট ফোন ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পেয়ে শিশুদের মধ্যে পেন বা পেন্সিল ধরার এবং তা ব্যবহারের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। একসময় শিশুরা দেখতো তার বাবা-মা পেন দিয়ে বাজারের ফর্দ লিখতেন, এখন তারা দেখে বাবা-মা মোবাইল ফোনে টেক্সট করছে। ২০১৬ সালের অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যেসব ছাত্ররা হাতে লেকচার নোটস লেখেন, তারা পরে সেগুলো অনেক ভালো মনে রাখতে পারে এবং তাদের ধারণা অনেক পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু কম্পিউটার বা ট্যাবে যারা নোটস নেন, তারা অনেক লিখতে পারলেও মনে রাখতে পারে না। ডিজিটাল আসক্তিতে শিক্ষার্থীরা মানসিক ও শারীরিকভাবেও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, খিটখিটে স্বভাব, উগ্রতা, হঠাৎ রেগে যাওয়া, অপরাধপ্রবণতা, উদ্বেগ, একাকী থাকতে ইচ্ছা করা, বুদ্ধির বন্ধুত্ব, ভালো কথার নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট করা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মানসিক উন্মাদনা, কল্পনাশক্তি হ্রাস, স্কুলে যেতে ইচ্ছা না করা, পড়াশোনায় অমনোযোগী, চোখের সমস্যা, ঘুম কম, অতিরিক্ত ওজন ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়া ইত্যাদি লক্ষণীয়। আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সম্প্রতি অনেক দেশ যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ইংল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডসসহ আরও কিছু দেশে স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে বা এর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলোর মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্মার্টফোনে আসক্তি রোধ করা, মনোযোগ বৃদ্ধি করা এবং পড়াশোনায় ব্যাঘাত কমানো।

প্রযুক্তি যেমন বিজ্ঞানের একটি অবিস্মরণীয় আবিষ্কার তেমনি এর ঝুঁকিও অনেক। আর তা যদি হয় শিশুর ক্ষেত্রে, তাহলে তা ভবিষ্যতের জন্য হুমকি। একটি শিশু যখন খুব সহজেই হাতের মুঠোয় স্মার্টফোন পেয়ে যায় তখনই সে নানা খারাপ সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে থাকে। যা তাকে ধীরে ধীরে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। সেজন্যে কোন বয়সে কতক্ষণ ডিজিটাল ডিভাইসের সঙ্গে কাটানো উচিত তা নির্ধারণ করা উচিত। স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রথম ৩ বছর পর্যন্ত শিশুর জন্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ভাল। ডিভাইসের পরিবর্তে শিশুকে মুখে ছড়া, গান, গল্প শোনানো উচিত। ৩-৮ বছরের শিশুর জন্য মাঝে মাঝে ১০-১৫ মিনিটের জন্য বড়দের তত্ত্বাবধানে গান, ছড়া, গল্প বা শিশু উপযোগী বিষয়গুলো দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সারাদিনে ৩-৫ বছরের শিশুর জন্য সর্বোচ্চ ৪০ মিনিটের মধ্যে স্ক্রিনিং (মোবাইল, টিভি, ট্যাব, কম্পিউটার বা এ ধরনের যে কোনো ডিভাইস হতে পারে) এর সময়সীমা রাখতে হবে। ছোট শিশুর জন্য যে কোনো কিছু স্ক্রিনে দেখার সময় সেটা থামিয়ে শিশুর সঙ্গে ঐ বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ পর পরই কথা বলা ভালো। সেটা দ্বিমুখী যোগাযোগ নিশ্চিত করে। ৫-৮ বছরের শিশুর যদি অনলাইনে ক্লাস করতে হয়, তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন একটানা সর্বোচ্চ ৪০ মিনিটের বেশি সে স্ক্রিনের সামনে না থাকে। প্রয়োজনে ১০-১৫ মিনিট বিরতির পর আবার ৪০ মিনিট থাকতে পারবে। সারাদিনে এই সময়সীমা ২ ঘণ্টার মধ্যে থাকা ভালো। যে কোনো শিশুর জন্য প্রথম থেকে ডিভাইস ব্যবহার একটি নিয়মের মধ্যে রাখতে হবে। শিশু বড়দের দেখেই শিখবে, তাই বড়দেরও ডিভাইস ব্যবহারে সময়সীমা মেনে চলা উচিত।

প্রযুক্তি ছাড়া আমরা সকলেই অচল। সারাদিনের সব কাজে আমরা প্রযুক্তির কাছে দায়বদ্ধ। আমাদের দৈনন্দিন কাজের সবকিছুর সঙ্গেই এর সম্পর্ক অতি নিবিড়। বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও এই প্রযুক্তির কাছে বন্দি। অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নানাভাবে তাকে সাহায্য করে। ছোট বাচ্চারা একা একা অক্ষর চিনতে পারে ট্যাবের সাহায্যে। খেলার ছলে বাসায় বসে নিজের পড়া শেষ করতে পারে। ক্লাসের পড়া থেকে শুরু করে নানা ধরনের অনুশীলনী এবং হোমওয়ার্ক/প্রজেক্টের কাজের তথ্য জোগাড় করতে পারে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট ও প্রযুক্তি শিশুকে সাহায্য করে। বাইরের দেশগুলোয় কী হচ্ছে তা সে জানতে পারে। তাকে সামাজিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে এই প্রযুক্তি। বলা যায় বাবা-মার অনুপস্থিতিতে প্রযুক্তিই তাদের কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু অতিমাত্রায় মোবাইল ও ডিভাইস আসক্তি শিশুর ভবিষ্যৎ মেধা বিকাশে যে বড় অন্তরায় তা স্পষ্ট। তাই ভার্চুয়াল জগতের ব্যবহারিক কৌশলগুলোকে শিশুবান্ধব করে সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইসগুলোকে তাদের জন্য শিক্ষামুখী নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং আনন্দময় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পরিচালনা করা উচিত।



অতিমাত্রায় মোবাইল ও ডিভাইস আসক্তি শিশুর ভবিষ্যৎ মেধা বিকাশে যে বড় অন্তরায় তা স্পষ্ট। তাই ভার্চুয়াল জগতের ব্যবহারিক কৌশলগুলোকে শিশুবান্ধব করে সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইসগুলোকে তাদের জন্য শিক্ষামুখী নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং আনন্দময় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পরিচালনা করা উচিত

লেখক : অধ্যাপক এবং তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
sarker@juniv.edu

সৌরবিদ্যুৎ ও বাংলাদেশ

সুরাইয়া আক্তার

আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতা এবং অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ঘরের অন্ধকার দূর করা থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে আলোকশক্তি ও তাপশক্তি সরবরাহ, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি চালনা, যোগাযোগব্যবস্থা সহজ করা, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। মানবজীবনে চব্বিশ ঘণ্টাই বিদ্যুৎশক্তির একচেটিয়া আধিপত্য দেখা যায়। আর সেই বিদ্যুৎ যদি সহজলভ্য হয়, তবে তা যে কোনো দেশের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর। সে ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ হতে পারে আশার আলো।

সূর্যের আলো থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে সৌরশক্তি বলা হয়। সৌরশক্তি ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তাই সৌরবিদ্যুৎ। সৌরবিদ্যুতের আবিষ্কারক ধরা হয় ফরাসি বিজ্ঞানী এডমন্ড বেকেরেলকে। তিনিই প্রথম ১৮৩৯ সালে ফটোভোলটাইক প্রভাব আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন, আলোর উপস্থিতিতে কিছু পদার্থ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। ১৯৮১ সালে চার্লস ফ্রিটস প্রথম বাণিজ্যিক সৌরকোষ তৈরি করেন এবং ১৯৫৪ সালে বেল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা প্রথম কার্যকরী সিলিকন সৌরকোষ তৈরি করেন। সূর্যের আলো থেকে সরাসরি ফটোভোলটাইক প্যানেল ব্যবহার করে বা পরোক্ষভাবে ঘনীভূত সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যথোপযুক্ত উচ্চ কম্পাংকের সূর্যের আলো যখন সৌর প্যানেলের ওপর ফেলা হয়, তখন সেখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত ইলেকট্রন প্রবাহিত হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আবার লেন্স বা আয়নার মাধ্যমে সূর্যের আলোকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে তাপশক্তি তৈরি করা হয়, যা পরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

এ মহাবিশ্বের বেশিরভাগ এলাকা প্লাজমা দিয়ে গঠিত। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলীর প্লাজমার মধ্যে থার্মোনিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফিউশন সংঘটিত হচ্ছে এবং অফুরন্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৬,০০০ কেলভিন এবং অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ১.৫×১০৭ কেলভিন। সূর্য সর্বক্ষণই তার তাপ, আলো ও অন্যান্য শক্তি বিকিরণের আকারে বিচ্ছুরণ করা সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার কোনো হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। আসলে সূর্যের অভ্যন্তরের প্রচণ্ড উত্তাপে স্বনির্ভর থার্মোনিউক্লীয় বিক্রিয়া হয়,



যা সূর্যের এ অফুরন্ত শক্তির উৎস। এ শক্তি কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি অনবায়নযোগ্য শক্তির মতো শেষ হবে না। সূর্যের এ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ, উন্নত এবং বিশ্বমানের করা সম্ভব।

সৌর প্যানেলের মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। সৌর প্যানেল হলো সিলিকনভিত্তিক ফটোভোলটাইক কোষ দিয়ে তৈরি, যা সূর্যালোককে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সৌর প্যানেলের মূল উপাদান সিলিকন বালি থেকে তৈরি হয়। সিলিকন গলিয়ে স্ফটিক ইনগট তৈরি করা হয়, যা পরে পাতলা ওয়েফার এ কাটা হয়। ওয়েফারগুলোতে ফসফরাস বা বোরনের মতো উপাদান মিশিয়ে ডোপায়ন বা ডোপিং করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওয়েফারের ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয়, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে। কোষগুলোর ওপর একটি অ্যান্টি রিফ্লেক্টিভ কোট দেওয়া হয়, যাতে বেশি সূর্যালোক কোষে প্রবেশ করতে পারে। পরে কোষগুলো একে অপরের সঙ্গে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে একটি মডিউল তৈরি করা হয় এবং কোষগুলো একটি কাচের স্তরের ওপর বসানো হয়। সৌর প্যানেলের ওপরের স্তর টেম্পারড গ্লাস দিয়ে তৈরি যা প্যানেলের সৌর কোষগুলোকে বাইরের ধুলোবালি, বৃষ্টি ও অন্যান্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এ গ্লাসটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও টেকসই হয়। পরিশেষে এর চারপাশে একটি অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম যুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের বালি সাধারণত ইলেকট্রনিক গ্রেড সিলিকন তৈরির উপযোগী নয়। কারণ ইলেকট্রনিক গ্রেড সিলিকন তৈরির জন্য অতি বিশুদ্ধ সিলিকা বালি প্রয়োজন, যা বাংলাদেশে নেই। তাই এটি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা ছাড়া সৌর প্যানেল তৈরি করার অন্য উপাদানগুলোও বিদেশ থেকে আনতে হয়। তবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল উৎস সূর্যালোক বাংলাদেশে সারা বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে উচ্চ সৌর বিকিরণ স্তর রয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে সৌরবিদ্যুতের সহায়তা দিন দিন বাড়ছে। অনাবাদি জমিতে স্থাপিত তিস্তা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটি দেশের জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, যা গাইবান্ধা ও রংপুর অঞ্চলের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। দেশের প্রথম ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জের বুলনপুরে অবস্থিত। এটিও জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েই চলছে। এ বাড়তি চাহিদা সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। আমাদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সৌরবিদ্যুতের সুবিধা হলো একবার সোলার প্যানেল স্থাপন করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো ঘাটতি হবে না। কোনো বাড়তি বিলও দিতে হবে না। বাংলাদেশে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। নদী বিধৌত চরাঞ্চল, অব্যবহৃত জমি এমনকি পানির উপরে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব। বাংলাদেশের শহরগুলোতে রয়েছে অসংখ্য উঁচু ভবন। এসব ভবনের ছাদ হতে পারে একেকটি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র। গ্রামীণ এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে সৌর প্যানেল স্থাপন করে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো যায় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমানো সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ ব্যক্তিগত চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে।

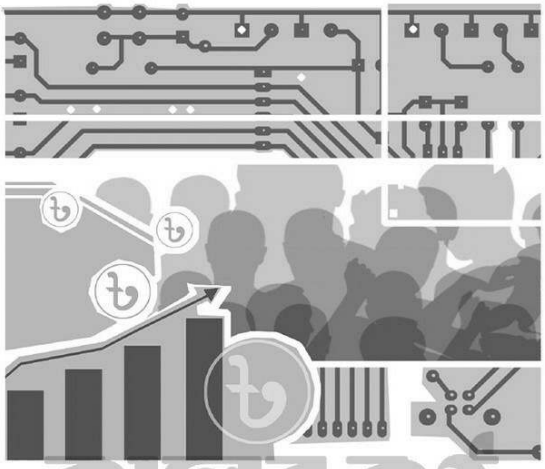
পরিবেশবান্ধব সবুজ জ্বালানি হিসাবে সারা বিশ্বে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সৌরবিদ্যুৎ অন্যতম ভরসা হতে পারে। কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে সৌরশক্তি কাজে লাগানো যায়। যেহেতু বাংলাদেশে সারা বছর প্রচুর সূর্যালোক পাওয়া যায়, তাই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও তা অত্যন্ত সহায়ক। বর্তমানে সোলার প্যানেলের দামও কমছে। এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের জন্য সৌরবিদ্যুৎ অপরিহার্য।

প্রাবন্ধিক ও প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান), বিক্রমপুর আদর্শ কলেজ, মুন্সীগঞ্জ।

ডিজিটাল অগ্রগতি : রূপান্তরের 'গুপ্ত' রহস্য



আব্দুল বায়েস



ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০১৩ সালের হিসাব মতে, যা মনজুর উল্লেখ করেছেন, একটা দেশে ডিজিটাইজেশন যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ওই দেশের মাথাপিছু জিডিপি বাড়বে ০.৭৫ শতাংশ এবং বেকারত্বের হার কমবে ১.২ শতাংশ

'People always fear change. People feared electricity when it was invented, didn't they? People feared coal, they feared gas-powered engines...There will always be ignorance, and ignorance leads to fear. But with time, people will come to accept their silicon masters'- Bill Gates

আজ থেকে প্রায় চার দশক পূর্বে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জে স্টিগলার বলেছিলেন, 'পণ্ডিতদের বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে তথ্য একটা মূল্যবান সম্পদ : জ্ঞানই শক্তি। তার পরও অর্থনীতির শহরে তার বসতি বস্তিতে। অনেকটাই অবজ্ঞায়।'

বাজারে অপ্রতিসম তথ্যপ্রবাহের (Asymmetric information) প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে ২০০১ সালে নোবেল জিতেছেন যে তিনজন, তাঁরা হলেন জে স্টিগলিৎজ, জি একারলফ এবং মাইকেল স্পেন্স। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা আইসিটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাজারে বিদ্যমান তথ্যপ্রবাহে সেই অসমতা দূর করতে সাহায্য করে বলে আজ তাঁর এত কদর সব জায়গায়। এর ফলে শুধু উৎপাদকের এবং ভোক্তার উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় তা নয়, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও ঘটে। মোটকথা, পাঠ্যবইয়ে পড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার বাজার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার শর্তটি বাস্তবে রূপ নেয় না অপ্রতিসম তথ্যের জন্য। গেল পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে তথ্যপ্রবাহের যে 'বিপ্লব' ঘটেছে তা যেন উন্নয়ন আলোচনায় গুরুত্ব পায় সেদিকে নজর দিতে হবে। তার আগে একটু পেছনে ফিরে যাওয়া যাক। পূর্ব প্রজন্মের মানুষদের কাছে হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া 'রানার' গানটি নিশ্চয় মনে আছে—দিনরাত রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে। পোস্টমাস্টার টরেটক্কা টরেটক্কা করে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন; তারবাহী টেলিফোনে কানফাটা চিৎকারে চারদিকে জানান দিয়ে কথা বলছেন কেউ। পাপিয়া সারওয়ারের গানটি ছিল দারুণ—'নাই টেলিফোন, নাইরে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম/ বন্ধুর কাছে মনের খবর কেমনে পৌঁছাইতাম।' সেই আমলে টেলিফোন কিংবা টেলিগ্রাম ছাড়া খবর পৌঁছানো ছিল কঠিন। বিশেষত শহরে গুটিকয়েক সৌভাগ্যবানের ঘরে অ্যানালগ টেলিফোন ছিল, যার সংযোগ পেতে ও কথা চালিয়ে যেতেও ছিল অনেক বিড়ম্বনা। ১৯৯৭ সালে বর্তমান নিবন্ধের লেখক যখন আইসিটির ওপর এক গবেষণা চালায়, তখন 'ভিলেজ পে ফোন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আশপাশে মাত্র ১০০টি গ্রামে মোবাইল ফোন ছিল, যা বর্তমানে প্রায় প্রতি ঘরে; একটা কম্পিউটারের দাম লক্ষাধিক টাকা, এখন বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের মতো; বর্তমানে উঁকিঝুঁকি মারছে ফাইভজি, জয়তু বাংলাদেশ।

সুতরাং সেদিন গত প্রায়। রানার, পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার, এনভেলপ এখন স্মৃতির অতলান্তে, ইতিহাসের পাতায়। পোস্টঅফিস এখনো বেঁচে আছে বাহাদুর শাহের বংশধরদের মতো। আজকাল চলছে তারবিহীন তেলেসমাতি—চিঠি মানে এসএমএস, ই-মেইল, ইন্টারনেট; টাকা আসে-যায় বিকাশে, গোপনীয় খবর হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মেসেঞ্জারে। পৃথিবী যেমন বদলে গেছে তেমনি গেছে বাংলাদেশ, অ্যানালগ টু ডিজিটাল বাংলাদেশ! রূপান্তরের রূপকথা ব্যাখ্যায় এক অসামান্য অনুচ্ছেদ!

দুই

বেশ কিছুদিন আগের কথা। বিআইডিএস আয়োজিত এক কনফারেন্সে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক (বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান) মনজুর হোসেন। নিবন্ধের শিরোনামটি ছিল—'আইসিটি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে ডিজিটাইজেশন কৌশল পুনর্বিবেচনা'।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দর্শনের সূত্রপাত ২০০৯ সালে উন্নয়নের পরিবর্তিত কৌশল হিসেবে এবং সেই লক্ষ্যে নীতিগত সংস্কার এবং বেশ বড় মাপের বিনিয়োগ অব্যাহত থাকল। সন্দেহ নেই যে সময়ের বিবর্তনে আইসিটিকেন্দ্রিক নির্দেশকে প্রভূত উন্নতি লক্ষ করা গেছে যথা মোবাইল ফোন পেনেট্রেশন, টেলি-ডেনসিটি, ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-গভর্ন্যান্স ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, অন্যান্য সূত্র থেকে ধার করে প্রাপ্ত কিছু তথ্য পেশ করা যেতে পারে : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুপাত তিন গুণ বৃদ্ধি—২০১৩ সালের প্রায় ৭ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ১৮ শতাংশ; ২০২১ সালের মে মাসে মোট ইন্টারনেট গ্রাহক ১৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রায় ১০ ভাগ ব্রডব্যান্ড এবং বাকিরা ইন্টারনেট মোবাইল ব্যবহারকারী; নিবন্ধনকৃত সফটওয়্যার এবং আইটি ১৫০০; টেলি যোগাযোগ ব্যতীত আইসিটি খাতে ১০ লাখ পেশাজীবী নিয়োজিত এবং আইসিটি রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের, প্রায় ৮০ ভাগ খানায় মোবাইল ফোন সুবিধা আছে ইত্যাদি।

গেল দশকের ৬ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধির হার এবং মোবাইল ফোন বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টে ডিজিটাইজেশন এবং অগ্রগতির সহগামিতার সাক্ষ্য বহন করে। ডিজিটাইজেশন এবং উদ্ভাবন অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে আসছে। আইসিটি খাতের উৎপাদন সরাসরি মূল্য সংযোজিত দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। তা ছাড়া আইসিটি উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে খাতগুলো দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নীত করতে পারে, যা মোট অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক।

যেমন—২০১০ এবং পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক আর রেমিট্যান্সের নিম্নগামী অবদানের মুখে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার একই সঙ্গে মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি, টিএফপি) এবং শ্রম উৎপাদিকা (লেবার প্রোডাক্টিভিটি) বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারত। আবার বোধগম্য নীতি সংস্কারের অনুপস্থিতিতে, হয়তো বিনিয়োগ এবং পুঁজির দক্ষতা বাড়িয়ে ২০১০ সময়ের বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধির ব্যাখ্যা মিলবে ডিজিটাইজেশনে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, আইসিটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রচুর অবদান রাখে, যথা যুদ্ধোত্তর আমেরিকার প্রবৃদ্ধিতে জ্বালানি জুগিয়েছে আইসিটি এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্প। আইটি উৎপাদনকারী শিল্প যুদ্ধোত্তর প্রবৃদ্ধির প্রায় আট ভাগ এবং যুদ্ধোত্তর উৎপাদনশীলতায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অবদান রেখেছিল। ভারতে সফটওয়্যার সেবা রপ্তানি মোট সেবা রপ্তানির ৪৫ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ৩.৫ শতাংশ।

এমন উদাহরণ আরো আছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০১৩ সালের হিসাব মতে, যা মনজুর উল্লেখ করেছেন, একটা দেশে ডিজিটাইজেশন যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ওই দেশের মাথাপিছু জিডিপি বাড়বে ০.৭৫ শতাংশ এবং বেকারত্বের হার কমবে ১.২ শতাংশ। অন্য এক গবেষণা দেখিয়েছে যে মোবাইল ব্যবহারকারীর আয় বৃদ্ধি ঘটে ৩-১০ শতাংশ—যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং রেমিট্যান্স থেকে, মহিলাদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সংকটের সময় ভোগ মসৃণকরণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ব্রডব্যান্ড পেনেট্রেশনের হার ১০ শতাংশ বাড়াতে পারলে বার্ষিক মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পায় ১ থেকে দেড় শতাংশ।

মনজুর হোসেনের গবেষণার গুরুত্বহল বাংলাদেশে আইসিটির অবদান কত এবং কিভাবে তা পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মোট উপাদান উৎপাদনশীলতায় সাহায্য করে। তিনি প্রবৃদ্ধির ওপর আইসিটির প্রভাব দেখতে গিয়ে মোট প্রবৃদ্ধিকে দুই দিক থেকে শনাক্ত করেছেন: উপকরণ শ্রম ও পুঁজির প্রভাব এবং মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (টিএফপি)। তবে তার আগে তিনি বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির চালক নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন—(ক) গেল দশকগুলোর তুলনায় ২০১০ দশকে প্রবৃদ্ধির উল্লম্ফন; (খ) রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে থাকলেও ২০১০-এর পর থেকে নেমে আসছে; (গ) রেমিট্যান্স প্রবাহও পড়ছে, তবে ২০১৯ থেকে প্রান্তিক ঊর্ধ্বমুখী এবং (ঘ) ২০১০-এর পর থেকে মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ দর্শনের সূত্রপাতের বার্তাবাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

শক্তিশালী ইকোনমেট্রিক হিসাব-নিকাশে প্রবৃদ্ধি ও আইসিটির যোগসূত্রতা নির্ণয়ণে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা বলে আমাদের ধারণা—অন্তত বাংলাদেশে। প্রথমত, জিডিপিতে আইটি সম্পর্কিত খাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ—ভারতের ২৬ শতাংশের বিপরীতে; আইসিটি উৎপাদনকারী খাতের জিডিপিতে অবদান প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, টেলি-ডেনসিটি এবং আইসিটি মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা এবং প্রবৃদ্ধির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অন্য কথায় ২০১০ দশকে উল্লেখ করার মতো সংস্কারের অনুপস্থিতিতে আইসিটিতে বিনিয়োগ ও ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া একমাত্র দৃশ্যমান নীতিসূচক পরিবর্তনের প্রকাশ।

তৃতীয়ত, আইসিটি উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়ই আর্থিক ও মুদ্রানীতিনির্ভর উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যাতে খাতগুলো বড় মাপের উদ্ভাবনে নিবিষ্ট হতে পারে। এরই মধ্যে কভিডের মধ্যে আমরা ডিজিটাইজেশনের বিরাট সুবিধা পেয়েছি, আর তাই দ্রুত রিকভারির জন্য আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থাপনার সুবিধার প্রয়োজন। এবং বলাবাহুল্য যে ডিজিটাল অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে আহরণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং ভারসাম্য উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে পারে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, সাবেক উপাচার্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Two years of genocide in Gaza: 77 years of denial

A chronicle of genocide streamed live on TV. The most fundamental measure of this holocaust is the destruction and staggering loss of life. Gaza today stands as the most ruthlessly bombarded place in history

writes
Jamal Kanj

Following the revolt of the besieged against their jailors on October 7, 2023, the Zionist *hasbara* machine mobilised across the world to impose a false narrative. Its goal was clear: erase history, distort reality, and present Israel as the eternal victim. According to this framing, Israel was a peaceful entity blindsided by an unprovoked attack that supposedly emerged out of nowhere.

October 7 did not fall from the sky. It was the culmination of decades of dispossession, siege, and systematic dehumanisation. Long before October 2023, Gaza was described by international observers as the world's largest open-air prison. It was subjected to a starvation diet blockade for more than 16 years, or 5,800 days. Long before that, its 2.3 million inhabitants, of whom 1.3 million are refugees or their descendants, were driven from their homes and villages in 1948 during the Nakba, a catastrophe created by Zionist terror militias who ethnically cleansed the native Palestinians to create a state for Jews escaping European hatred.

To understand October 7, one must place it within the continuum of Palestinian suffering. That single day was not an aberration. It was one out of nearly 28,000 days since 1948 of Zionist hate and Israeli oppression. Each day carried the weight of exile, siege, humiliation, poverty, and hopelessness. Yet hasbara wants to delete those decades from recorded memories, 28,000 days of Palestinian statelessness, and reduce history to a single day divorced from context.

The "first October 7" was not in 2023; it was in 1948, when Zionist terrorist militias, transformed into today's Israeli army, committed massacres, razed villages, and expelled Palestinians en masse. That foundational act of ethnic cleansing continues today. The daily bombardment, the starvation, the denial of basic human dignity to the people of Gaza are extensions of that original Zionist sin.

The hasbara's greatest weapon is controlling the media, reframing narrative and selective memory. It seeks to decontextualise memory and conceal the structural violence that made October 7, inevitable. To remember the 28,000 days that preceded it is to expose the ongoing injustice at the heart of this so-called war: a colonised, besieged people struggling for survival against an occupying power that insists on their permanent subjugation.

Two years have passed since Israel unleashed its genocide plan. A strategy of systematic destruction, of homes, hospitals, schools, infrastructure and of life itself. Gaza today is not a war zone. It is a graveyard of a people suffocated before the eyes of a world that lost its humanity.

Two years, twenty-four months, seven hundred and thirty days more than that one October 7 day. However measured, life since October 2023 has been an eternity of suffering for the people of Gaza. A chronicle of genocide streamed live on TV. The most fundamental measure of this holocaust is the destruction and staggering loss of life. Gaza today stands as the most ruthlessly bombarded place in history: measured by explosives per square meter, Israel has dropped nearly seventy times more bombs on Gaza than the Allies did on Germany in World War II, and one hundred times more than the U.S. dropped on North Vietnam during Operation Rolling Thunder. As of September 2025, more than 66,000 people have been murdered, among them at least 19,424 children. Thousands more are "missing," buried anonymously under the rubble of their own homes. Young lives have been erased; thousands of stories have ended before they began. The total number of injured has surpassed 167,500, leaving an overwhelming number of survivors with life-changing injuries. Since Israel broke a ceasefire in March 2025 alone, 12,956 souls have been lost. Altogether, the injured and dead, represents more than 10 per cent of Gaza's population. These are not collateral casualties; they are the intended victims of a deliberate campaign of erasure of the Palestinian existence.



Smoke rises from a collapsed residential building following an Israeli airstrike in Gaza City, September 5, 2025 —Xinhua Photo

Beyond bombs and bullets, another insidious weapon is claiming lives: starvation. A Zionist-engineered famine, declared by the UN-backed Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Over 500,000 people are living under Phase 5 conditions—the highest level, characterized by "starvation, destitution, and death." At least 440 people have died from starvation, including 147 children, with hundreds of thousands more lacking food or clean water. The International Rescue Committee reports that one in three young children have gone at least 24 hours without food.

Every one of Gaza's 625,000 students has been out of school for two years. More than 18,000 students and 972 teachers have been killed. Nearly 92 per cent of schools are damaged or destroyed, all universities lie in complete ruins. The WHO reports over 2300 health and aid workers have been killed, and out of Gaza's 36 hospitals, just 14 partially function.

To cover its crimes, Israel closed Gaza to the international media and targeted local journalists working inside Gaza. According to Brown University, Israel has killed more journalists in Gaza since October 2023, than in the US Civil War, World Wars I and II, the Korean War, Vietnam War, the wars in the former Yugoslavia and the post-9/11 war in Afghanistan – combined. Israel murdered 278 with little to no protest from the "free world" or the "free press." By refusing to confront Israel's censorship of reporting from Gaza, they betray the very principles of truth and freedom they claim to champion.

This is not war; it's a premeditated genocide by the letter of the law. The 1948 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide defines genocide as acts committed with "intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group." Article II lists five acts: (1) Killing members of the group: 66,000 and counting; (2) Causing serious bodily or mental harm: thousands of child amputees; (3) Deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about physical destruction: blocking food aid, destroying farmland, 92 per cent of homes destroyed; (4) Imposing measures intended to prevent births: targeting fertility clinics; (5) Forcibly transferring children.

Israel has committed at least the first four—indisputably, systematically, and publicly. The mass killings, the maiming of tens of thousands, and the starving of civilians fall squarely within the Convention's threshold.

The International Association of Genocide Scholars (IAGS) announced on 31 August 2025, that Israel's actions in Gaza meet the definition of genocide under the UN Convention. Article III of the Convention extends responsibility not only to perpetrators but also the enablers of the genocide. That means Washington, London, Berlin, and Paris. Following the International Criminal Court indictment of Israeli leaders, any country that finances and arms indicted war criminals is responsible under Article III and could be brought before the ICC.

In its last phase of the holocaust in Gaza city, on October 1, the Zionist war minister, Israel Katz authorised, or koshered, the targeting of the remaining 250,000 civilians in the city when he classified them all as "terrorist." Civilians who lacked the physical or financial means, or those who refused to leave their homes and not become refugee statistics in a new Israeli-made Nakba.

This genocide isn't Israel's alone; it's the collective moral failure of the so-called Western civilization. By enabling indicted war criminals, providing them the genocide tools, and diplomatic protection, Western governments have exposed the selective value system they uphold. Their conspicuous silence, even as a war minister labels 250,000 civilians "terrorists," reveals "Western values" as nothing but a cynical façade masking their hypocrisy and racial hierarchy.

Jamal Kanj is the author of Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America, and other books. The piece is excerpted from www.counterpunch.org

Move to merge five Islamic banks entails pitfalls and prospects



MD KHAIRUL HASAN, CSAA

In a landmark and unprecedented move, the Bangladesh Bank has initiated the merger of five financially distressed Islamic banks-First Security Islami Bank, Social Islami Bank, Global Islami Bank, Union Bank, and EXIM Bank-into a single state-owned entity tentatively named "United Islami Bank." The decision, taken at a special meeting of Bangladesh Bank's Board on September 16, marks the beginning of a massive overhaul of the country's banking landscape.

The central bank moves towards the merging process in a bid to prevent systemic collapse of the country's banking sector burdened with chronic corruptions, accumulated mismanagements, politically motivated lending, and record levels of non-performing loans (NPLs). At the time of merger, NPL ratios in these banks reportedly ranged between 70% and 90%, threatening the stability of the financial system and eroding public confidence on banking sector.

Globally, mergers and acquisitions (M&A) in banking are often pursued for strategic reasons-to build scale, expand reach, and enhance efficiency of banks, and similar organizations. When Standard Chartered acquired ANZ Grindlays Bank, for instance, the focus was on integrating systems, processes, and client portfolios to achieve synergy and improve profitability.

In Bangladesh, however, mergers are typically driven by necessity rather than opportunity. With 62 scheduled banks in operation, many are small, weak, or poorly governed. A number of them face liquidity shortages, capital erosion, and governance failures. The central bank's decision to consolidate these troubled shariah-based lenders reflects both a sense of urgency and an attempt to restore oversight and discipline.

While the merger aims to stabilize the system, it faces immense challenges on multiple fronts.

Financial Fragility: The new bank inherits the toxic legacy of five deeply troubled institutions, with an estimated 77% of their combined loans classified as non-performing. The government's planned capital injection of Tk25,000 crore-part of a Tk35,000 crore provisioning shortfall-will help absorb immediate losses. Additional funds may come from developing partners, insurance funds, and international lenders such as the World Bank and IMF. However, without structural reform and accountability, these financial infusions risk becoming mere stopgaps.

Operational Integration: To bring in a single platform of merging five banks with distinct IT platforms, regulatory systems, and corporate cultures is a monumental task. The new institution will have over 16,000 employees, 779 branches, 698 sub-branches, and roughly 1,000 ATMs. Aligning processes, eliminating redundancies, and migrating data securely across incompatible systems will require enormous technical and managerial effort. History shows that merging weak banks does not automatically create a strong one.

Governance and Political Influence: At the root of the crisis of these banks lies chronic governance failure. Several of the merging banks are accused of irregular lending and insider transactions involving politically exposed groups, notably S. Alam Group, Sikder Group and NASSA Group. For the new bank to succeed, it must be insulated from political interference and run by professionals with ethical standards, and proven integrity. Without this, the same governance culture that led to collapse could resurface under a new name.

Legal and Institutional Uncertainty: Questions have emerged about whether Bangladesh Bank possesses the legal mandate to enforce such a large-scale merger. Some stakeholders have already filed petitions in court, potentially delaying the process. Legal clarity and a well-defined regulatory framework will be vital to sustain confidence.

Employee Morale and Public Trust: Merging five organizations inevitably leads to anxiety among employees over job security, pay scales, and career progression. While the central bank has pledged that no jobs will be cut, operational streamlining will be unavoidable. Simultaneously, depositors' apprehension about the safety of their funds must be addressed. A clear, consistent communication strategy is essential to reassure both employees and the public.

Shariah Compliance and Identity: Since the merged institution will operate as a Shariah-based entity, maintaining strong Shariah governance will be critical. Given the past record of non-compliance among some of the merging banks, the new bank must restore credibility through a transparent and unified Shariah governance framework.

Bangladesh is not alone in using consolidation to stabilize the banking sector. In 2021, India merged ten public sector banks into four, aiming to enhance capital efficiency, profitability, and scale. Sri Lanka, too, has considered merging small and mid-sized banks to strengthen financial resilience.

Yet, Bangladesh's own history offers cautionary lessons. The merger of Bangladesh Shilpa Bank and Bangladesh Shilpa Rin Sangstha into Bangladesh Development Bank Ltd (BDBL) failed to deliver meaningful reform. The merged entity still struggles with default loans, demonstrating that structural weaknesses cannot be resolved by mergers alone. The then government's merger initiative of distressed Padma Bank with EXIM Bank went into futile.

To ensure that the creation of United Islami Bank may be a success story rather than another failed experiment, several key measures must be taken:

- Autonomous Regulatory Body: Full autonomy of central bank must be ensured to complete the ongoing reformation process, so that no political or outside interference can hurdle the overhaul drives. To this effect, the BB board, however, has already approved the draft amendment to the Bangladesh Bank Order, which will be passed in the government's next advisory council meeting. This order will empower the BB full autonomy. Earlier, the government passed the Bank Resolution Ordinance, 2025 empowering the BB to proceed for financial sector resolution.

- Independent and Professional Board: A new board of directors must be formed, composed of professionals with proven expertise, Islamic banking knowledge, and unbiased independence. Political or vested interest appointments should be strictly prohibited.

- Strong Risk and Credit Management: The bank should adopt international best practices in credit appraisal, risk management, and provisioning to reduce NPLs and ensure asset quality.

- Robust Shariah Governance: A credible and empowered Shariah Supervisory Board must oversee compliance, ensuring all products, investments, and governance processes adhere to Islamic principles and governance.

- Legal Clarity: The central bank and Ministry of Law should expedite the legal framework for the merger, eliminating uncertainties and protecting depositor rights.

- Employee Engagement: Transparent communication on roles, compensation, and transition plans will help retain talent and minimize morale issues.

- Public Confidence and Communication: The government must launch a comprehensive awareness campaign assuring depositors of the safety of their funds and the bank's long-term viability.

- Technology-Driven Integration: Implementing modern IT and data systems will streamline operations, prevent fraud, and enhance customer experience.

- Performance-Based Governance: Compensation for management should be tied to measurable performance indicators such as NPL reduction, profitability, and service quality. Over time, the government should consider partial privatization by bringing in institutional investors to ensure sustainability and accountability.

The creation of United Islami Bank represents one of the boldest financial restructurings in Bangladesh's history. While the merger is necessary to contain systemic risks, its success will depend on execution, integrity, and transparency.

If implemented prudently-with professional leadership, sound governance, and effective oversight-this merger could mark a turning point for the banking sector, restoring trust and stability. But if old habits persist, the risk remains that five troubled banks will simply become one large troubled bank.

The path ahead demands discipline, transparency, and unwavering political will. The future of Bangladesh's financial stability may well depend on how this historic consolidation is managed.

The writer is an Islamic banker and financial sector analyst

Our young graduates lack skills to get jobs



JENNIFER HOSSAIN

Bangladesh is seeing an increasing number of university graduates every year, yet many struggle to secure meaningful employment. Employers across industries consistently point out the "skill gap" the difference between what young graduates bring to the table and what the workplace requires. To succeed, graduates need to prepare not only academically but also through co-curricular activities and practical experiences that strengthen their employability.And it is not only about getting a job; to sustain and grow in one's career, qualities such as efficiency, dedication, and sincerity are equally important for earning promotions and long-term success.

A good academic record remains essential. Strong grades, relevant coursework, and subject mastery show commitment and discipline. But in a competitive market, degrees alone rarely guarantee jobs. Recruiters evaluate how well graduates can apply their knowledge in real-world contexts, communicate ideas clearly, and contribute productively to teams.

The ability to write clearly, speak confidently, and listen attentively is critical. Employers want graduates who can prepare concise reports, draft professional emails, deliver presentations, and participate effectively in meetings both in Bengali and English.

Graduates must demonstrate initiative and analytical thinking. Rather than waiting for instructions, they should be able to assess situations, identify challenges, and propose practical solutions.

Almost every job now requires proficiency in digital tools. Excel, Google Workspace, project management platforms, and even basic data visualization are expected. Graduates with strong digital fluency stand out.

Workplaces thrive on collaboration. The ability to adapt, respect diverse opinions, and contribute meaningfully in teams is just as important as individual expertise. Punctuality, responsibility, and integrity send a strong signal that a graduate can be trusted. Employers value reliability as much as technical skills. Industries evolve quickly. Those who show curiosity, openness to feedback, and willingness to learn new skills will have long-term employability.

Graduates who actively connect with peers, mentors, and professionals open doors to opportunities that are not always advertised. Networking is both a skill and a career strategy.
Employability does not begin after graduation; it starts from the first year of university. Students should actively engage in co-curricular activities to build transferable skills:

- Debate and Public Speaking Clubs: Improve communication, confidence, and critical thinking.
- Model UN or Student Leadership Roles: Teach negotiation, diplomacy, teamwork, and leadership.
- Volunteering and Social Impact Projects: Develop empathy, problem-solving, and project management.
- Sports and Cultural Activities: Build resilience, discipline, and collaboration.
- Internships and Part-time Work: Provide exposure to workplace culture and professional networks.
- Entrepreneurship and Competitions: Encourage innovation, risk-taking, and business acumen.

Such experiences give graduates practical examples to showcase during interviews and demonstrate qualities beyond academics.

Prepare a Strong CV and Cover Letter: Customize applications to highlight relevant skills. Use measurable achievements, not just responsibilities. Build a Professional Online Profile: LinkedIn is today's digital resume. Keep it updated with internships, volunteer experiences, certificates, and projects. Leverage Internships and Volunteering: Even unpaid roles provide valuable skills and networks that often lead to paid opportunities. Practice Interview Skills: Employers prefer authentic stories over rehearsed textbook answers. Share specific challenges, solutions, and lessons learned. Network Strategically: Attend job fairs, seminars, and alumni gatherings. Relationships often unlock hidden job opportunities. Stay Patient and Resilient: Job searching takes time. Rejections are part of the journey, but each one builds experience.

Action Plan for Students:

- Maintain good grades and communication skills.
- Engage in at least one co-curricular activity every semester.
- Complete one internship or volunteering experience per year.
- Build a professional online presence with a digital portfolio.
- Practice CV writing, SOP writing, and interview skills regularly.
- Network with faculty, alumni, and industry mentors.

Employability is not about securing the first job; it is about building the skills and mindset to sustain a long-term career. Graduates who combine academic excellence with communication, problem-solving, digital fluency, teamwork, and strong professional networks are more likely to thrive.

For students, the message is clear: preparation must begin early. Every debate, internship, volunteer project, and networking event adds value to your profile. With the right skills and proactive career planning, Bangladeshi graduates can not only secure jobs but also build meaningful careers in the global market.

The writer is Director, International Affairs and Director (in-charge), Career Services Office at the University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB)

How to become an enlightened man



PROF DR MD
GOLAM SHAROWER

In physics, we understand light as a type of energy that is transmitted as electromagnetic waves in space (in a vacuum) and through various media (such as air, water, glass) and gives us the feeling of seeing. It is a transverse wave, which exhibits both particle and wave properties. This broad form of light extends from gamma rays to radio waves, where visible light is only a small part of this electromagnetic spectrum. When light falls on a substance, all aspects of that substance are revealed.

When I was a child reading in school, all the teachers used to advise me to be an enlightened person. I cherished the deep-rooted idea in my mind that an enlightened person really removes the darkness of society. Whenever I heard a good person talk, I knew his good humanitarian work, then I understood that he was an enlightened person. Again, when I heard it from my father, 'a man may live not by year but by achievements'. When we saw people like Palan Sarkar selflessly distributing books even in his old age to spread the light of humanity along with the light of his eyes. Then I felt that the birth of an enlightened person was worthwhile. Humans are the best creation of God. Those who came as guides of all religions have the same moto of wellbeing of humanity. The main task of them was to enlighten people.

We know that the beloved Prophet Muhammad (SM), the messenger of peace. When the Prophet (peace be upon him) came to this world, it was in darkness. That is, there was no light in the heart of man. When light falls, man can easily distinguish between good and evil, right and wrong, humanity, cruelty, truth and falsehood. The beloved Prophet transformed the people who were shrouded in darkness into the best people in the world through that light. Although we are far away from the era of Hazrat Muhammad (PBUH), his ideals are eternal in the hearts of all Muslim Ummah.

Today, even though we are educated in modern education, we are removing darkness by distributing that light. The World Literature Center also has a slogan, "We want enlightened people". Why should darkness take its place amidst so much light? Why should truth be covered by falsehood in that darkness? Why should the oppressed be crushed by the oppression of the oppressor? Why should the power of light be extinguished by the power of darkness. The people who are taking bribes, committing corruption, engaging in illegal trade, in the hope of making extra profits are driving up the prices of essential goods beyond the reach of the common people, and are increasing out pocket expenditure in the name of basic human needs such as medical treatment, thereby causing extreme suffering to the people.

> *When I was a child reading in school, all the teachers used to advise me to be an enlightened person. I cherished the deep-rooted idea in my mind that an enlightened person really removes the darkness of society*

From here, the question arises who these people are. Because no parents in the world want their child to be immersed in darkness. No school, college, or university is built with the intention of making people blind. No teacher teaches injustice, lies, or inhumanity. Then why is there so much injustice, corruption, oppression, and tyranny in the world? Then should we understand that these people were not born in the womb of any mother? Did they not study in any school? Did they not go to any teacher? The answers to the questions are very clear and obvious to all of us.

Rather, the people who are leading the most ugly and heinous acts in darkness today are almost all highly educated and, in most cases, the highly respected children of parents from very elite and noble families. So does it not prove that deep and strange darkness is being born from all enlightened arrangements. What will be the name of this darkness? Think for a moment! If we call this darkness enlightened darkness, will it be a lie? Or is there more to be said? All darkness is engulfing us today. Everyone has covered all enlightened education, civilization and magnificence with the cloak of their own ugly (dark) thoughts for their own profit. On the Corruption Perception Index or CPI scale, 148 countries of the world have been revolving in the vicious circle of corruption for a long time. The biggest problem in the whole world is environmental degradation. Where muscle power, economic arrogance and the arrogance of power are creating the grave of all morality.

What is left to understand just by looking at the people of Gaza. How humanity is disappearing in the illuminated darkness. How the world's shameless leader, who violates humanity, covered the enlightened human civilization with a cloak of darkness. Just by looking at our small country, it becomes clear how the black claws of power easily civilization and humanity are destroyed. How easily all the drains and ditches of Dhaka city are taken over and filled.

All the ways to drain the dirty water are blocked. The city dwellers are waterlogged. How easily prices of goods go up during various festivals. How much does it cost for the two Eids? How easily double the transportation fare. How easily the extreme suffering of people increases with the pull of the pulse of people returning to remote villages. In the month of Ramadan how can the prices of iftar items really increase so much? How can the prices of unripe products be increased due to the extra profit? Fruits are laced with deadly poisons. How easily profit-hungry syndicates are being formed. How can easily low-quality, unhealthy food be painted with eye-catching toxic colors and sold at a higher price.

Countless ordinary people of the country are being crushed by debt. Is there a single solution in all areas of life, including education and medical care?

How easily toxic junk food shops are being set up in the city without any playgrounds around schools, colleges, and universities. Our future generation is being developed as an inactive disabled nation due to the consumption of this junk foods. How much corruption and excess money is being taken in the country's land registry and mutation. We are wandering in strange darkness. The controllers of this visible cycle are not uneducated stupid people. At the root of these activities are those enlightened people, who have actually enlightened themselves in the darkness for the sake of flourishing. Until this enlightened darkness is removed, is the freedom of humanity possible? But the thing of hope is our new generation. Just as the convergent property of light can bring together light rays and illuminate something and ultimately burn, similarly, with the cooperation of us, new generation will remove all darkness and fill the entire world with light.

The writer is an academician

Will bank mergers satisfy reform needs?

Enforced mergers should not be cosmetic fixes. They should catalyze genuine reform, backed by credible audits, cleaned up balance sheets, and boards that meet high governance standards

Mamun Rashid

Reforming Bangladesh's banking sector is not just a recommendation but an urgent necessity. The industry has struggled for years with liquidity shortages, weak resource management, capital inadequacies, and a stubborn stock of underperforming loans.

If these weaknesses remain unaddressed, they threaten not only individual institutions but also the resilience of the entire economy.

Against this backdrop, talk of bank mergers has grown louder. Many of the so-called good banks, however, remain apprehensive about how such moves might be executed and whether the burden will fall unfairly on well-managed institutions too.

The Bank Company (Amendment) Act, 2023 gives Bangladesh Bank clear authority to mandate mergers when leadership is seen to undermine depositors' interests. Complementing this is the Prompt Corrective Action framework, introduced in December 2023, which sets a structured response to early signs of stress.

Banks that fail to maintain healthy indicators such as the capital to risk-weighted assets ratio, tier 1 capital ratio, common equity tier 1 ratio, net non-performing loan levels, and sound corporate governance are to be placed under corrective measures. Persistently weak performance raises the risk of penalties and, ultimately, enforced consolidation.

In theory, consolidation can strengthen weak banks by leveraging the discipline, systems, and capital stewardship of stronger institutions. In practice, success demands transparency, robust planning, and trust among all parties.

A central concern is opacity around the true health of several weak banks. Many are suspected of underreporting bad loans. Non-performing assets are sometimes hidden behind accounting choices or evergreening, so declared defaults sit below reality.

For any sound bank considering an acquisition, that uncertainty translates into the risk of inheriting undisclosed liabilities. Without credible audits and full data, the foundation for meaningful integration is shaky.

A second concern is fair identification. There are fears that political influence could skew lists, shielding institutions linked to powerful individuals regardless of performance. State-owned banks that have long struggled with inefficiency and losses may also receive undue protection at the expense of taxpayers and the broader economy.

If these questions are not addressed, the entire exercise risks being undermined and public trust will erode. Reform must begin with facts, clean data, and consistent rules that are applied to every institution.

Even when the right candidates are chosen, mergers carry heavy operational and financial challenges. Combining balance sheets can worsen asset quality, increase costs, and strain liquidity if integration moves slowly. People integration is difficult as employees from different cultures and incentive systems must align.

Technology platforms, risk models, and compliance processes require harmonization that is complex and costly. During the transition, customers may worry about service quality or stability and may shift their business unless communication is clear and continuity is protected.

> *Handled with care, transparent timelines and fair incentives can turn consolidation into a truly durable, confidence restoring reform*

Given this landscape, it is understandable that strong, well-run banks feel little incentive to acquire weaker peers. An ill designed merger could pull down a healthy buyer's indicators and expose it to unforeseen losses.

Bangladesh Bank should therefore develop a clear menu of incentives to encourage participation, such as capital relief, tax benefits, transitional support for systems integration, and time bound regulatory accommodations tied to measurable milestones.

Equally important is decisive action against repeat offenders and willful defaulters so that responsible players see fairness in the process and feel confident to step forward.

Global experience offers practical lessons. During the integration of Standard Chartered and ANZ Grindlays in this region, the most delicate work was price discovery for both tangible and intangible value, especially brand equity. Equally critical was the careful amalgamation of assets and liabilities and the stitching together of operating systems.

Above all, the human dimension mattered. ANZ Grindlays was large and respected, Standard Chartered was profitable and established. Winning the hearts of employees, retaining customers, and aligning cultures proved as important as the spreadsheets.

Comparable lessons arise elsewhere. Citibank acquired KORAM Bank in South Korea and Guangdong Development Bank in China. Standard Chartered took over Bank Permata in Indonesia and later sold it to Bangkok Bank. In India, Bank of Baroda merged with Dena Bank and Vijaya Bank to build scale.

Outcomes varied. Citigroup later divested its stake in Turkey's Akbank, and HSBC exited the United States consumer loans business when operations proved unsustainable. These cases show that due diligence, integration discipline, and cultural alignment decide success more than the announcement headline.

From these experiences, several principles stand out.

1. Clear central bank guidelines reduce uncertainty for boards and investors.
2. Accurate valuation of assets and liabilities prevents value transfer and future disputes.
3. Practical share swap modalities help align shareholders.
4. A supportive legal environment lowers execution friction in areas like competition approvals, tax treatment, labour transitions, and creditor rights.
5. Strong political will ensures that rules are applied consistently, even when decisions are difficult or unpopular.

Bangladesh's consolidation push should be guided by these principles. Enforced mergers should not be cosmetic fixes. They should catalyze genuine reform, backed by credible audits, cleaned up balance sheets, and boards that meet high governance standards.

Incentives for acquiring banks should be transparent and conditional, unlocking benefits only when integration milestones and customer protection thresholds are met. Customers must be kept at the centre through clear communication, deposit protection, and continuity of essential services.

There is also a role for market discipline. Listing requirements, timely disclosure, and empowered independent directors can complement supervisory tools. Technology can help uncover emerging stress through granular data on sectoral exposures and repayment behavior.

Over time, a stronger resolution toolkit, including purchase and assumption structures and bridge entities, can reduce uncertainty and make future rescues less ad hoc.

Handled with care, transparent timelines and fair incentives can turn consolidation into a truly durable, confidence restoring reform. ●

Mamun Rashid is a banker and economic analyst.